ললনাকে "পাহাড়ে মেয়ে" সাজাইবার আবশ্যক রাখে না। পুরাতন প্রথা সমূহে দুই একটী দোষ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে সমাজের অধিকতর অপকারের সম্ভাবনা। এই সকল কারণে বলা যায় বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা যাহা আছে তাহাই থাকুক। ইত্যাদি।

এই পরস্পর বিরোধী মত লইয়াই দেশ আন্দোলিত হইতেছে এবং এইরূপ মতবৈষম্য দ্বারাই বঙ্গসমাজে, অনেক গুরুতর কার্য্যে সুফল পাওয়া যাইতেছে না। যাহাহউক উল্লিখিত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, উভয় মতের আংশিক সত্যগুলি স্পষ্ট অনুভূত হয়। এসম্বন্ধে আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা পরে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

মঙ্গলময় জগদীশ্বরের অভিপ্রায়ে স্ত্রী ও পুরুষ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মে ইহাদিগের পরস্পর পার্থক্য আছে। যে বিশ্ববিধাতা জগতে জড়াণু জীবাণু প্রভৃতি পদার্থকে স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তিনিই স্ত্রী পুরুষদিগকে তাহাদিগের কার্য্যোপযোগী বিভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। পুরুষজাতি স্বভাবতঃ দৃঢ়চেতা, বলবান্, সাহসী ও তেজস্বী; স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোমলহৃদয়া, দুর্ব্বলা মৃদুস্বভাবা, লজ্জাশীলা ও ভীরু। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পুরুষজাতি স্ত্রীলোকের রক্ষাকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং স্ত্রীজাতি পুরুষজাতিকে ভয়ে অভয়দাতা, বিপদে সহায় ও কার্য্যে সৎসাহসবিধাতা জানিবেন; পুরুষ জাতিও রমণীগণের নিকট দয়া, ক্ষমা, সেবা, সুখ, শান্তি পাইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিবেন, কি স্ত্রীজাতিকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া কেবল নিজেরা জ্ঞানালোকে আলোকিত হইবেন, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। সন্তান প্রসব করণ, শিশু পালন, গৃহধর্ম্ম সংরক্ষণ এগুলি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঐশিক নিয়ম হইলেও উহা যে রমণী-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, একথা নিঃস্বার্থভাবে বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। পুরুষের জীবনের উদ্দেশ্য যেমন আত্মোন্নতি করিয়া পরোন্নতি করা, রমণীরও সেইরূপ; তবে আধুনিক সময়ে দেশের সাধারণের মন যেরূপ অনুন্নত ও স্ত্রীজাতির প্রতি সমাজের যেরূপ অবজ্ঞা, তাহাতে রমণীদিগের বাহ্যিক স্বাধীনতা যে সময়োপযোগী এমন কথা বলিতে পারি না। বাহ্যিক স্বাধীনতা তো দূরের কথা, বঙ্গবাসিনীদিগের পরিচ্ছদের যেরূপ হীনত্ব, তাহাতে সময়ে সময়ে আত্মীয় পুরুষদিগের সম্মুখীনা হইতেও সঙ্কুচিতা হইতে হয় *। যাহাহউক

* বঙ্গাঙ্গনাদিগের পরিচ্ছদের হীনত্ব সকলেই জানেন; একখানি সাড়ী ইঁহাদের লজ্জানিবারক ও অঙ্গাবরণ। আজিকালী বডী, জ্যাকেট

বঙ্গাঙ্গনাকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে পুরুষ জাতি উদাসীন থাকিলে বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। রমণী অন্তঃপুরে থাকিয়া উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হউন, তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ ও গৃহ উপযুক্ত রূপে উন্নত হউক; যাহাতে রমণীর স্বাভাবিক চরিত্র পরিস্ফুট হয়, তদ্বিষয়ে পুরুষেরা যত্ন করুন; রমণীর ইচ্ছামত তাঁহাকে পবিত্র ও শিক্ষাপ্রদ স্থান, নিজেরা সঙ্গে করিয়া দেখান, দেশ ভ্রমণ কালে রমণীদিগকে সঙ্গে লইয়া নৈসর্গিক শোভা সকল তাঁহাদিগকে দেখাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও তত্তৎদেশীয়দিগের স্বতন্ত্র রীতি নীতি পর্য্যালোচনা করাইয়া অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিন; সুশিক্ষিতা রমণীগণকে রমণী জাতির নেত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করুন, এবং নিজেদের সহকারিণী করিয়া দেশের উন্নতি স্রোত উন্মুক্ত করিতে থাকুন, তাহাহইলে দেশের—এ দুরবস্থাপন্ন বাঙ্গালা দেশের অনেক অভাব দূর হইবে এবং পুরুষেরাও সুশিক্ষিতা রমণীগণের নিকটে অনেক প্রত্যুপকার পাইতে পারিবেন। এইরূপে কার্য্য করিলে পূর্ব্বোক্ত বিরোধী মতেরও সামঞ্জস্য হইতে পারে।

বাঙ্গালী রমণীদিগের অবস্থা যাহা এতদূর বিবৃত করা হইল, তাহাই যথোচিত হইল না; ইহা ব্যতীত অপোগণ্ড বালিকার পাণিপীড়ন, বহু বিবাহ, কন্যা বিক্রয়, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি, সম্প্রদায় বিশেষে প্রচলিত থাকায় বঙ্গীয় রমণীর অবস্থা সমধিক ভীষণ ও শোচনীয় করিয়াছে। তবে আমরা যখন সাম্প্রদায়িকতা পরিহার পূর্ব্বক বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতেছি, তখন সে সকল কথা বিশেষরূপে অনালোচ্য। কিন্তু এই টুকু বলিতে চাহি যে সম্প্রদায় বিশেষে, বঙ্গাঙ্গনার অবস্থা দারুণ বিভীষিকাময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাধারণতঃ বঙ্গাঙ্গনাগণের মানসিক অবস্থা কতকদূর উন্নত হইয়াছে। রুচিও অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়াছে। এখন উল্‌কির পরিবর্ত্তে গহনা, শাঁখার পরিবর্ত্তে কত সুন্দর চুড়ী, নথের পরিবর্ত্তে মুক্তা, রাঙা সাড়ীর পরিবর্ত্তে তিন, চারি পেড়ে (গবর্ণর জেনেরলের নাম পর্য্যন্ত পেড়ে) সাড়ীপরিধান করেন, সেকেলের কিছুই পসন্দ করেন না। বাঙ্গালায় স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচার অল্পদিন হইয়াছে, ইহার মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই লেখা পড়া শিখিয়াছেন; কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি লাভ করিয়াছেন, কেহ কেহ উচ্চ দরের সাময়িক পত্রের সম্পাদন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, কেহ গ্রন্থকর্ত্রী, কেহ বিজ্ঞানের কেহ দর্শনের গভীরতত্ত্ব সকলও গ্রন্থাকারে (সহজে) প্রকাশিত করিয়াছেন। অনেকে উচ্চ-

---

প্রভৃতি ধনী পরিবারেরই ব্যবহার্য্য, সাধারণের জন্য নহে। এবিষয় আন্দোলন হইতেছে, সহরে অপেক্ষাকৃত উন্নতিও হইয়াছে, পল্লিগ্রামের প্রতি দৃষ্টি আবশ্যক।

শ্রেণীর কবি আখ্যাও পাইয়াছেন— অধিক কি জাতীয় মহাসমিতিতেও কেহ কেহ বঙ্গমহিলার প্রতিনিধি হইয়াছেন। কিন্তু আগে যেরূপ বলিয়াছি, ইহা সাধারণ বঙ্গমহিলার চিত্র নহে; আর অনেক মহিলার অবস্থাও এসকল কার্য্যের অনুকূল নহে; তবে এ সকল কার্য্য দ্বারা তাহাদের মানসিক উন্নতির প্রারম্ভ হইয়াছে, একথা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ডি আলেমবার্ট।

ইনি ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পারিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যখন সদ্যোজাত শিশু, তখন পারিস নগরের এক বৃদ্ধা রমণী ইহাকে একটী ধর্ম্ম মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধা শিশুটীকে পাইয়া পরম রত্ন জ্ঞানে আপন কুটীরে লইয়া গেলেন এবং অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। শিশুটীকে পাইবার দুই এক দিন পরেই জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক বৃদ্ধার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকটী বৃদ্ধকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর শিশু-টীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা কোথায় কি প্রকারে শিশুকে পাইয়া-ছিলেন, সমস্ত বর্ণনা করিলেন। তখন সেই ভদ্রলোক বৃদ্ধার দয়ার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তুমি এই অনাথ শিশুকে আপন বুকে স্থান দিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছ। বেশ তুমি শিশুটীকে লালন পালন কর, খরচ পত্রের জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই, আমিই সমস্ত যোগাইব।" বৃদ্ধা বাঁচিয়া গেলেন এবং দুহাত তুলিয়া ভদ্রলোকটীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তদবধি সেই ভদ্রলোক শিশুর খরচ পত্র যোগাইয়া আপন বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। শিশু বৃদ্ধার যত্নে ও সেই ভদ্রলোকের সাহায্যে ক্রমে মানুষ হইলেন এবং ফরাসী দেশীয় লোক সমাজে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ডি আলেমবার্ট ফরাসী দেশের গৌরব স্বরূপ হইয়াছিলেন। সুবি-খ্যাত ফরাসী "এনসাইক্লোপিডিয়া" গ্রন্থাবলীর গণিতের অংশটী সমস্তই তাঁহাদ্বারাই লিখিত হয় এবং এই গ্রন্থা-বলী সম্পাদন বিষয়ে তিনি ডিডিরোকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রুসি-য়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক ডি আলেম-বার্টের পরম সুহৃদ ছিলেন। তিনি তাঁহাকে বার্লিন নগরে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে বৃদ্ধার কুটীর হইতে

স্থানান্তরিত করিতে পারেন নাই। রুসিয়ার রাজ্ঞী ক্যাথারিন্ তাঁহাকে আপন পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিলেও ডি আলেমবার্ট বলিয়াছিলেন, যে যত দিন জীবিত থাকিবেন, তিনি এই সামান্য কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইবেন না। ধন মান টাকাকড়ি লইয়া ডি আলেমবার্ট পারিস নগরে মহা সুখ ভোগে দিন কাটাইতে পারিতেন, যেরূপ আয়োজন থাকিলে জন সমাজে গণ্য মান্য হওয়া যায়, ডি' আলেমবার্টের সেইরূপ বস্তুর কোন অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রাণ সেদিকে গেল না। তিনি মান ও সুখ্যাতি অপেক্ষা শান্তি ও স্বাধীনতাকে অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি অনাথ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, অনাথিনী দুঃখিনীর ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছিলেন এবং চিরকাল সেই দুঃখিনী পালনকর্ত্রীর কুটীরে থাকিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন।

বিদ্যাসাগরের জননী।

দরিদ্রের গৃহে জগদ্বিখ্যাত মহা পণ্ডিত, তেজস্বী ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুসন্তানের জন্মগ্রহণ পাশ্চাত্য দেশ সমূহে নিতান্ত বিরল না হইলেও ভারতবর্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। দুঃখ দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিয়া, একাহার ও অনাহারে জীবন যাপন করিয়া পরিশেষে জনসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারা এই অলস উদ্যমবিহীন দেশে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া অনুভূত হইলেও পরলোকগত মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র জীবন কাহিনীতে সে দৃষ্টান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দরিদ্রাদপি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তর কালে সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুরুষরত্নে পরিণত হইলেন, ইহার গোপন তত্ত্ব কোথায়? কেহ কি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, কেন ক্ষুদ্র দরিদ্রসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরে পরিণত হইয়াছিলেন? কেহ কি সূক্ষ্মদর্শন সহকারে অনুসন্ধান করিয়াছেন, কি কি উপকরণ একত্রিত হইয়া মহামনা মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের মহাচরিত্র গঠন করিয়াছিল? চিন্তাশীল বুদ্ধিমান লোক দেখিতে পাইয়াছেন যে বিদ্যাসাগররূপ পুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ে তাঁহার জননী সেই পুণ্যবতী গঙ্গময়ী বঙ্গললনার কোমল হস্ত দুইখানি নিরন্তর পশ্চাৎ হইতে খাটিয়াছে, সেই দয়াবতী সাধ্বীর কোমল হৃদয় বিন্দু বিন্দু ক্ষরিয়া বিদ্যাসাগররূপ

মহাসাগরের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই হিন্দুললনাই পরম যত্নে ঈশ্বরচন্দ্রকে লালন পালন করিয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যাসাগর আজ বাঙ্গালী জাতির মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার পুণ্য কাহিনীর গীতধ্বনিতে সমগ্র ভারত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাই আজ আমরা সেই গরীয়সী রমণী রত্নের গুণ-পনার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতে প্রয়াস পাইব।

তিনি বড় সরলহৃদয়া রমণী ছিলেন। লোকের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ বিপন্ন ব্যক্তি যদি দরিদ্র হইল, যদি কোন প্রকারে শুনিতে পাইতেন যে কোন অসহায় পুরুষ বা স্ত্রীলোক সাহায্যাভাবে ক্লেশ পাইতেছে, তাঁহার হৃদয় অমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তিনি নিরন্তর পরসেবাতেই সময়াতিপাত করিতেন। বীরসিংহ গ্রামের অনেক দরিদ্র লোক এখনও সাক্ষ্য দিবে যে তিনি দিবারাত্রি জাতিনির্ব্বিশেষে হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের বাড়ীতে পীড়িত লোকের পথ্যের ব্যবস্থা করিতেও তাহাদিগকে ঔষধ খাওয়াইতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাকে সন্ধান করিতে গিয়া দেখা যাইত যে তিনি কোন অস্পৃশ্য জাতির দ্বারে বসিয়া সে বাড়ীর রোগীর পথ্যের বা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন। অনেক সময়ে সাগু ও মিছরি সঙ্গে থাকিত, যাহাদের রাঁধিবার লোক না থাকিত, তাহাদের জন্য নিজে বাড়ী আসিয়া পথ্য রাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে দরিদ্রের সেবা করিতেই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত।

একবার বাড়ীর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ছয়খানি লেপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী লেপ কয়খানি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। জননীর নিজের ব্যবহারের জন্য এবং অন্য কাহারও কাহারও জন্য সে গুলি আসিয়াছিল। পাড়ায় প্রতিবেশীগণের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে এক গৃহের পরিবারেরা শীতে অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে—এমন শক্তি নাই যে শীত নিবারণের উপযোগী কোন বস্ত্রাদি ক্রয় করে। সেই জননীসদৃশা গৃহিণী সেই দরিদ্র গৃহস্থকে একখানি লেপ দিয়া অবশিষ্ট কয় খানিও শেষে ঐরূপে নিতান্ত শীতক্লিষ্ট লোকদিগকে দান করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন যে "ঈশ্বর, তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি এইরূপ বিপন্ন লোকদিগকে দিয়া দিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্য লেপ পাঠাইয়া দিবে।" অনেক সময় দুই প্রহরের পর পর্য্যন্ত অনাহারে বসিয়া থাকিতেন, কেন না যদি কোন অতিথি বা ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে না খাওয়াইয়াত আর খাওয়া হবে না। এরূপও শুনা গিয়াছে যে তিনি

ভাত রাঁধিয়া থালায় করিয়া লইয়া পাড়ায় যাহারা খাইতে পাইত না তাহাদিগকে আহার করাইয়া শেষে আহার করিতেন।

হ্যারিসন সাহেব যখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি একবার বীরসিংহ গ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল পরিদর্শনে গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে বাটীতে ছিলেন। মায়ের নিকট অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ান হ্যারিসন সাহেবের আগমন সংবাদ দিবামাত্র জননী অমনি বলিলেন "ছেলেটিকে একবার আমাদের বাটিতে আনিবে না? তাহাকে একবার আমাদের বাটিতে আনিয়া কিছু খাওয়াইলে ভাল হইত।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ জননীর নামে হ্যারিসন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহেব নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন। সাহেব বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। স্বহস্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ও অন্ন নিজ পাক করিয়া সাহেবকে খাওয়াইতে বসিলেন। এক এক করিয়া যেটির পরে যেটি খাইতে হয়, তাহা নিজে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। হ্যারিসন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মায়ের এরূপ উদারতা, স্নেহমমতা ও ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন "আমি আপনার বাটীতে আসিয়া, এখানে আহার করিয়া, সর্ব্বোপরি আপনার মায়ের করুণস্বভাব ও আদর যত্নে মুগ্ধ হইয়াছি। চিরদিন এ স্মৃতি আমার প্রাণ মন অধিকার করিয়া থাকিবে।"

আহার করাইয়া শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী সাহেবকে বলিলেন 'দেখ বাছা, তুমি যে কাজ লইয়া আসিয়াছ, এ বড় কঠিন কাজ, খুব সাবধান হইয়া এ কাজ করিবে, যেন গরিব দুঃখীলোক তোমাকে আপনার লোক মনে করিয়া সুখী হইতে পারে, তুমি সর্ব্বদা সকলের কথা ভাল করিয়া শুনিবে, লোকের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, তুমি এমন ভাবে এখানে থাকিবে যে, তুমি চলিয়া গেলে এখানকার লোক চিরদিন যেন তোমার নাম করিয়া কৃতজ্ঞ হয়। তুমি দুঃখীর বন্ধু হইয়া যেন এখান হইতে যাইতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে।"

হ্যারিসন সাহেব মেদিনীপুর অবস্থান কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মায়ের পরামর্শমত চলিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইতেন। তাঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে পরে বলা যাইবে।

মানুষ কতদিন অনিদ্রায় থাকিতে পারে ?

অনাহারে কতদিন জীবিত থাকা যায়, বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর হইল ডাক্তার টেনার চল্লিশ দিবস কাল অনাহারে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পর আমেরিকার অন্য এক শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ৬০ ষাটি দিবস কাল অনাহারে ছিলেন। এখন কেহ কেহ মনে করেন যে ষাটি দিবসের অধিক কালও অনাহারে থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব নহে। অনাহারে যদি মানুষ বাঁচিতে পারে, নিদ্রা ব্যতিরেকে মানুষের কত দিবস বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, কিছুকাল হইল আমেরিকার কয়েকজন শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত তাহা স্থির করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। তাঁহাদের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে ছয় জন সুস্থকায় ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করেন। অন্যূন অষ্টাহ নিদ্রা যাইব না তাঁহারা এইরূপ সংকল্প করেন। ৩০এ মার্চ্চ সোমবার দিবস হইতে তাঁহারা নিদ্রা পরিত্যাগ করেন। ছয় জনের মধ্যে চারিজন বিশেষ চেষ্টা করিয়া বৃহস্পতিবার রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরিত থাকিতে সক্ষম হইয়া তৎপরে নিদ্রামগ্ন হয়েন। অবশিষ্ট দুই জনের নাম টাউন্‌সেণ্ড ও কনিংহাম। টাউন্‌সেণ্ড রবিবার দিন বৈকালেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন। একমাত্র কনিংহামই পূর্ণ আট দিবস কাল জাগরিত থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নিদ্রা ত্যাগ করিলে কি প্রকার শারীরিক কষ্ট হয়, তাহা টাউন্‌সেণ্ড্ ও কনিংহাম্ সবিশেষ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন অনিদ্রা জন্য শারীরিক ও মানসিক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব হয়, এমন কি বলপূর্ব্বক নিদ্রা হইতে বিরত থাকা ঘোর অপরাধীর পক্ষে কঠোর দণ্ডস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। আহার না করিলে যেমন মানুষ কৃশকায় হইয়া যায়, দীর্ঘকাল নিদ্রা ত্যাগ করিলেও যে শরীর কৃশ হয় তাহা টাউন্‌সেণ্ড ও কনিংহামের দৃষ্টান্ত হইতে জানা যাইতেছে। তাঁহারা উভয়েই আট দিবসের অনিদ্রায় কৃশ হইয়া যান। টাউন্‌সেণ্ড ও কনিংহাম্ তিন সের কমিয়া গিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই জোর করিয়া একদিন অনাহার অনিদ্রায় থাকা যেখানে কঠিন, ধর্ম্মার্থে হৃদয়ের অনুরাগে সেখানে ৩ দিন ৩ রাত্রি থাকিলেও কোনও ক্লেশ হয় না। আমরা অবগত হইয়াছি কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম সাধনার্থ দুই মাসকাল বিনা নিদ্রায় নির্ব্বিঘ্নে কাটাইয়াছেন। ইহার মধ্যে অবশ্য কিছু রহস্য আছে।

নারী-হৃদয়ের মহত্ত্ব।

না জানি কি অপরাধে গেছে আণ্ডামান?
চির-নির্ব্বাসিতা নারী,জীবনের মায়া ছাড়ি
ভীষণ তরঙ্গে কেন ভাসাইছে প্রাণ?
শিকলি বাঁধিয়া করে,আশ্চর্য্য কৌশল ক'রে
তুলিছে নাবিকগণে সাগরের তীরে,
ভাবিয়ে অবাক্ মন, বিস্ময়েতে নিমগন,
দেখাবে বীরত্ব হেন বল কোন্ বীরে?
নর-কর পরশনে, নারীর পবিত্র মনে,
পাপ প্রলোভন পাশ করে সর্ব্বনাশ,
পলকে ফিরিয়া মতি, পাপ পথে হয় গতি,
পবিত্র হৃদয় হয় নরক নিবাস।
কুসংসর্গ ছাড়ি যবে, বিচরণ করে ভবে,
স্বর্গদেবী আবির্ভূতা যেন গো ধরায়;
উদার নিঃস্বার্থ প্রাণে, পরহিতে করে দান,
আত্মসুখ স্বার্থ পানে ফিরেও না চায়।
সোণার প্রতিমা খানি, সুধামাখা মিষ্টবাণী,
দয়াতে করেছে নারী বিশ্ব পরাজয়;
এসেছে পরের তরে,সে কিরে শমনে ডরে,
নামিছে আকণ্ঠ জলে অটল নির্ভয়!
বিপন্নজনেরেহেরে, নারীকিথাকিতেপারে?
পাষাণে বাঁধিয়া বুক? বাঁচাইবে তায়
মনেতে সংকল্প করি, জীবনাশা পরিহরি,
পশিছে জীবনে যেন পাগলিনী প্রায়।
ছিল বটে পাপীয়সী, এত যে নির্ম্মল শশী,
সেও দেখ কলঙ্কিত-নিষ্কলঙ্ক নয়;
যে কাজ করেছে তারা,হয়েসবে আত্মহারা,
সে কাজের পুরস্কার যদি কিছু হয়;
এক মাত্র মুক্তিদান,(উপযুক্ত প্রতিদান)
নহিলে কি দিবে আর তার বিনিময়ে?
আসিয়ে আপন দেশে, বন্ধুবান্ধবের পাশে,
সুখেতে ভুঞ্জুক দিন তাহাদের লয়ে।
যতনারী এ ভারতে,সবে মিলি এক মতে,
যাচ জননীর কাছে করি প্রাণপণ;
নিশ্চয় ভারতেশ্বরী, অপরাধ ক্ষমা করি,
দিবেন মুকতি দান ওহে ভগ্নীগণ!
পশিল মায়ের কাণে, এ বারতা মুক্তিদানে,
কুন্ঠিতা হবে কি মায়? দয়াময়ী যিনি!
ধন্য ধন্য ক্ষমা গুণে, তুল্য নাই ত্রিভুবনে
অবলার অপরাধ ক্ষমিবেন তিনি।
বিচূর্ণ অর্ণবযান, আরোহীরা ভাসমান,
অকূল পাথারে আজ কে বাঁচাল প্রাণ
তুলিয়া সাগর তীরে, জলমগ্ন নাবিকেরে?
ছিল নয় এক দিন রাক্ষসী পাষাণ!
বারাঙ্গনা নাহি ভুল, দেখায়ে বীর্য্য অতুল,
রাখিল অতুলকীর্ত্তি রমণীসমাজে,
তাদের উদ্ধার লাগি,লও সবে ভিক্ষা মাগি,
মুক্তিদান দিতে রাজি হবেন ইংরাজে।
ধরামাঝে বীর জাতি,ইংরাজের সে সুখ্যাতি,
বাড়িবে দ্বিগুণতর দিলে মুক্তিদান।
তাঁরা না করিলে আর,কোথা হবে সুবিচার
বীরাঙ্গনা বলি কেবা করিবে সম্মান?
বঙ্গের ভগিনীগণ, কর সবে প্রাণপণ,
জলন্ত উৎসাহে মাতি চালাও লেখনী,
করি ঘোর আন্দোলন, গলাও মায়ের মন
কৃপাদৃষ্টি করিবেন মোদের জননী।
সাধিতে এ মহাকাজ,করিও না কালব্যাজ
বীর নারী বলি আজ দেও পরিচয়;
নির্ব্বাসিতা দুখিনীর, ঘুচাও নয়ন-নীর,
নিরখি নয়ন তৃপ্ত করি এ সময়।
কি করি ভেবে না পাই,এমন শকতি নাই,

জলন্ত কবিতা লিখে জাগাই সবায়,
যেন গো পরের তরে, সকলেরি অশ্রু ঝরে,
পায় সে সহানুভূতি যেবা নিঃসহায়।
সেদিন আসিবে কবে, আমাদের ভাগ্যে সবে
দেখিব ভারতে নব-জীবন সঞ্চার,
ভারত রমণীকুল, দেখায়ে দয়া অতুল,
পরিচয় দিবে হেন মহা-প্রাণতার?

শ্রীচ।

বিবিধ তত্ত্ব।

১। আমেরিকার অন্তঃপাতী কালিফরনিয়া প্রদেশের ভূমি অতি উর্ব্বর। ইহার উর্ব্বরতা শক্তির বিশেষ গুণ এই যে তদ্দেশের বৃক্ষসকল পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা প্রকাণ্ড ও দীর্ঘ-কালস্থায়ী হয়। ঐ সকল দেশে এক্ষণে যে সকল প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর অন্যান্য কোন স্থানে দেখা যায় না। ইহার মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা দীর্ঘে দুই শত হাত এবং তাহার প্রস্থ কুড়ি হাত। দৈর্ঘ্যে একশত এবং প্রস্থে পনর হাত এরূপ বৃক্ষ কালিফারনিয়ায় সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন এবং সহস্র বৎসরেও কিছুমাত্র বিকৃত হয় না।

২। দক্ষিণ আমেরিকার চক্‌টোয়া নামক অসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত যে তাহারা মৃত দেহ দাহ না করিয়া বিবিধ দ্রব্য সংযোগে তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে প্রত্যেক মানবাত্মা এক সময়ে পুনরায় তাহার ভৌতিক দেহে প্রবেশ করিয়া এই জগতে বিচরণ করিবে।

৩। পীড়িতা মাতার দুগ্ধ পান করিলে যেমন সন্তানের পীড়া হয়, সেইরূপ যে গাভী রোগগ্রস্ত, তাহার দুগ্ধ পান করিলে সেই রোগ হয়, অথবা শরীরে সেই রোগের বীজ প্রবিষ্ট হইয়া অস্বাস্থ্য উৎপাদন করে। মাতা কোন অস্বাস্থ্যকর খাদ্য আহার করিলে যেমন তাঁহার দুগ্ধ সন্তানের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়, সেইরূপ যে গাভী কুদ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহার দুগ্ধ পান করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। গাভীর দুগ্ধ নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যপ্রদ করিতে হইলে গাভীর আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ঘাসের মধ্যে অনেক বিষাক্ত বা দোষবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তৃণাদি বা চারা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। গাভীকে যে ঘাস খাইতে দেওয়া হয়, তাহার সহিত কোন অজ্ঞাত গাছ বা তৃণ না থাকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপ বিষাক্ত তৃণ ভক্ষণে গাভীর কোন অপকার না হইতে পারে, কিন্তু তাহার দুগ্ধ অত্যন্ত দূষিত হয়। গাভীর আহার ও গাভীর স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ প্রদর্শিত হয় না বলিয়া দুগ্ধের সহিত আমাদিগের শরীরে রোগের বীজ প্রবেশ করে।

৪। ওজোন্ নামক বাষ্প অন্যজন বাষ্প অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে সুগন্ধযুক্ত পুষ্প নিচয়ের মধ্যে অধিকাংশ জাতীয় পুষ্প হইতে প্রচুর পরিমাণে এই পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর বাষ্প নিঃসৃত হয়। অনেক বৈজ্ঞানিকের এরূপ মত যে যে প্রদেশ অস্বাস্থ্যকর সেখানে যদি প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি পুষ্পের বৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহা হইলে সে প্রদেশের অস্বাস্থ্যকরতা নিশ্চয়ই বিদূরিত হয়।

৫। নিউগ্রানাডায় একটী বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার ত্বকের রস কালী রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ঐ রসে লিখিয়া দেখা গিয়াছে যে কালীর ন্যায় উহা বহু দিন স্থায়ী হয়। প্রথমে লিখিলে উহা ঈষৎ লালবর্ণ দেখা যায়, পরে উহা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে এই বৃক্ষের চাষ করিলে কালী প্রস্তুত করিবার আর আবশ্যকতা থাকিবে না।

৬। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত বিবাহ-রীতি অতি অদ্ভুত। কোন যুবক কোন বালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বালিকার কর্তৃপক্ষীয়েরা কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসের প্রাতঃকালে বালিকাকে বনের মধ্যে রাখিয়া আইসে এবং এক ঘণ্টার পরে তাহারা যুবকের নিকট আসিয়া বালিকাকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করে। যুবক যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বালিকাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে, তাহা হইলে সে তাহার পাণি গ্রহণের অধিকারী হয়, নচেৎ তাহাকে বিবাহ করিবার তাহার দাবী জন্মে না।

দোষ ও গুণ।

ঠিক্ যদি সকলের জীবনী সংকলন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে মনুষ্য মাত্রেরই জীবনে অন্ততঃ একটী ভুল চুক কিম্বা একটী গুণ পাওয়া যায়। "ঈশ্বর মনুষ্যকে কখনও নিরবচ্ছিন্ন গুণ কিম্বা নিরবচ্ছিন্ন দোষ দিয়া নির্ম্মাণ করেন না," প্রকৃতি নিজেই যেন এই কথা ঘোষণা করিতেছেন। যেমন আঁধারকে পরিত্যাগ করিলে আলোর গৌরব বুঝিয়া উঠা যায় না—যেমন দুঃখকে পরিত্যাগ করিলে সুখের স্বাদ গ্রহণ করা যায় না, তেমনি দোষ না থাকিলে গুণের উজ্জ্বলতা কেহ দেখিতে পাইতেন না। আমরা আলো আঁধার, সুখ দুঃখ, দোষ গুণ ইত্যাদি ঠিক্ পরস্পর পরস্পরের বিপরীত দেখিতে পাই; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে ঠিক্ তাহা নহে—আমাদের চক্ষের অগোচরে ঈশ্বর ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়কে (অর্থাৎ সুখ দুঃখের প্রতিদ্বন্দ্বী,

আলো আঁধারের প্রতিদ্বন্দ্বী, দোষ গুণের প্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদি) এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, কেননা উহার একটী না থাকিলে অপরটী অর্থশূন্য হইত। যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমরা পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিতে পাই অর্থাৎ সূর্য্য দিবাপতি আর চন্দ্র নিশাপতি; সূর্য্যের উত্তাপ গরম, চন্দ্রের উত্তাপ শীতল, চন্দ্র সূর্য্যে যেমন বিলক্ষণ ঘনিষ্টতা আছে অর্থাৎ সূর্য্যের করে চন্দ্র উজ্জ্বল, তেমনি দোষ গুণ যেন বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াও একসূত্রে গ্রথিত। মনুষ্যের জীবনী নিজে না লিখিলে কিম্বা না বলিলে কেহ কাহার প্রকৃত জীবনী বলিতে বা জানিতে পারেন না। ইতিহাস সমূহে যে সমস্ত লোকের জীবনী আমরা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে হয়ত অল্প দোষীর কেবল গুণ মাত্রই বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাতে দোষমাত্রও স্পর্শ করিতে পায় নাই, আবার অন্য পক্ষে অল্প গুণীর যে অল্প পরিমাণে গুণ আছে তাহারও অপলাপ করা হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে মনুষ্য নিজ-জীবনী নিজে অপকটচিত্তে লিখিলে যেমন বিশুদ্ধ সত্য জীবনী দেখিতে পাওয়া যাইবে, অন্যের সঙ্কলিত জীবনী তেমন হইবে না। কবিবর বায়রণ যদি অসঙ্কুচিত মনে নিজের জীবনী নিজে না লিখিয়া যাইতেন কিম্বা কোন কোন অংশ গোপন করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় ভক্তিভাজন অত বড় কবি চরিত্রে অতটা দাগ কখনও দেখিতে পাইতাম না। আমরা যে লোকনিন্দার ভয়ে জীবনে সর্ব্বদা আত্ম দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করি, কি ভুল! জীবনান্তেও সেই লোকনিন্দা যাহাতে না হয় সে জন্যও আত্মকার্য্য গোপন করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি না। বায়রণ যদিও চরিত্র দোষে দোষী, তথাপি তাঁহার নিজ জীবনের সত্য ঘটনাগুলি লিখিয়া তিনি আমাদের ভক্তিভাজন হইয়াছেন, কেননা সত্যের কর্কশতাও ভাল। একটী মন্দ কার্য্য করিতে যাঁহার লজ্জা বোধ না হইয়া লোকে প্রকাশ হইবে বলিয়া লজ্জা হয়, তাঁহার সে লজ্জার মূল্য অতি কম-নাই বলিলেও চলে। যাহাহউক পূর্ব্বাপর সকল লোকেই যদি নিজ নিজ জীবনী' অর্থাৎ জীবনের সত্য ঘটনাগুলি লিখিয়া বাক্সে রাখিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনী পাঠে লোকের স্বভাব, মানসিক গতি, ও কি কার্য্যের কি ফল ইত্যাদি বিষয়ে বিলক্ষণ উপদেশ কিম্বা শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যাইত। যদিও উপদেশ ও শিক্ষার জন্য অনেক পুস্তক আছে, কিন্তু সেই সকল পুস্তক আবার অনেকের নিকট কেবল "তোতার পড়া" মাত্র। যেমন "মিথ্যা কথা কহিলে পাপ হয়," "নবনীতে, অলাবু গোমাংস" "উত্তর শিয়রে শুইলে দোষ" ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে কে কিরূপ ফল প্রাপ্ত

হইয়াছেন, তাহা যদি বর্ণিত থাকে, তাহা হইলে ঐ উপদেশ গুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, অন্যথা কেবল "তোতা পড়া"। তাই বাস্তবিক মনুষ্যের জীবনের ঘটনা ও কার্য্যাকার্য্যের ফলাফল আদ্যোপান্ত সমস্তই জানিতে পারিলে অতি সহজে উপদিষ্ট হইতে পারা যায়। "মনে কর রবিনসনক্রুসো" "জোসেফ উইলমট" "হরিদাসের গুপ্ত কথা" ইত্যাদি পুস্তক যদি কল্পনাপ্রসূত না হইয়া কোন এক ব্যক্তির বাস্তবিক জীবন হইত, উহা আমাদের মন কত আকর্ষণ করিত !

কবিগণের কাব্য ও নভেল নাটকের নায়ক নায়িকাকে লেখক নিখুঁত সুন্দর করিতে নিজের সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটি করেন না, (অবশ্য বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসোদ্দীপক নাটকের কথা বলিতেছি না।) তিনি যেরূপ চরিত্র-সৌন্দর্য্য ভাল মনে করেন, নায়ক নায়িকাকেও সেইরূপ সৌন্দর্য্যে চিত্র করেন, তিনি যেরূপ বাগ্মিতা সভ্যতাকে বুদ্ধির পরিচায়ক মনে করেন, নায়ক নায়িকাকে কিম্বা নায়ক নায়িকার অনুকূলে অন্য কাহার দ্বারা সেরূপ বাগ্মিতা ও বুদ্ধির কার্য্য প্রদর্শন করেন। কাল্পনিক কাব্যাদির কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। যে সকল গ্রন্থে ঐতিহাসিক সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, আমরা সেই সকল ইতিহাস ও কাব্যের লোকদিগকে লইয়া দোষ গুণের একত্র সমবেশ দেখাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, যাঁহার জীবনের ঘটনা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ যে তাহা বিশুদ্ধতা,র লিখিতে সক্ষম, সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তাহা থাকিলেও উক্ত কাব্য ও ইতিহাসে যাহা লেখা আছে, তাহা ধরিয়া "দোষ গুণ" লিখিব। এইখানে বলিয়া রাখি যে, যিনি বিখ্যাত গুণবান্ তাঁহার গুণের বিষয় ত সকলেই জানেন, অতএব তাঁহার যে অল্পমাত্র দোষের উল্লেখ তাহাই দেখাইব, আর যিনি বিখ্যাত দোষী, তাঁহার দোষাবলী ত সকলেই জানেন, সুতরাং তাঁহার যে অল্প গুণ আছে তাহাই দেখান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, কারণ ঐ সকল গ্রন্থস্থ লোকদিগের নাম, গোত্র, কুল, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, যুদ্ধ, রাজত্ব ইত্যাদি প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহ অনেকাংশে সত্য হইলেও ঐ লোকদিগের মধ্যে গ্রন্থকার যাঁহাকে সুন্দর আঁকিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার দোষাংশ বর্ণন করিয়াও গুণ বলিয়া ঐ দোষের প্রশংসা করিয়াছেন আর দোষীর দোষগুলি কোন কোনস্থলে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। সে গুলি এস্থলে সবিস্তর লেখা অনাবশ্যক, কেন না আমাদের প্রবন্ধের নাম "দোষ ও গুণ।" এখন অনেক লোকের দোষ ও গুণ দুই আছে, কি না দেখা যাউক।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম শ্রীমতী নির্ম্মলা সোম এবৎসর ইংরাজী সাহিত্যে 'এম এ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কুমারী চন্দ্রমুখী বসু বাঙ্গালী রমণীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'এম এ', ইনি দ্বিতীয়।

২। যে মুক্তিফৌজের অদ্ভুত বিবরণ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংস্থাপক জেনারেল বুথ আগামী ৮ই জানুয়ারী কালকাতায় পদার্পণ করিবেন। ইনি বর্ত্তমান সময়ে একজন অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান্ লোক।

৩। মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা শূরচন্দ্র যিনি রাজ্যসম্পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া কলিকাতায় অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন, গত ৩রা ডিসেম্বর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণা এড়াইয়াছেন।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। শিশুরঞ্জন রামায়ণ—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। সরল সুমিষ্ট কবিতায় ৬০ পৃষ্ঠার মধ্যে রামায়ণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ গুনপনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া বালকগণ রামায়ণের স্থূল গল্প ও নীতি যেমন শিখিতে পারিবে, সেইরূপ মূল রামায়ণ পাঠেও অনুরাগী হইবে।

২। প্রেমের জয়—শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তি প্রণীত, মূল্য ৵১০ আনা। কয়েকবার বামাবোধিনীতে মুক্তিফৌজের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমাদিগের লেখক বন্ধু তাহা পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছেন। বামাবোধিনীর প্রবন্ধের আর আমরা কি সমালোচনা করিব? তবে পাঠক পাঠিকাগণকে ইহা এক একবার পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

৩। বঙ্গে মহাপ্রলয়—শ্রীগৌরী প্রসাদ মজুমদার প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত, কবিতাগুলি শোকোদ্দীপক।

বামারচনা।

পথিক।

১

অচেনা পথিক আমি তোদের দুয়ারে;
ঘুরি ঘুরি সারাদিন
হয়েছে শকতি হীন,
তোরা কা'রা এলি মোরে ভালবাসিবারে?
আমি তো অচেনা পান্থ রয়েছি দুয়ারে!

২

আমারে ডাকেনা কেউ 'আয় কাছে আয়;'
যতন মমতা স্নেহ,
আমারে করেনা কেহ,
কে তোরা—ডাকিলি কেন মধুর কথায়?

এ যে গো তোদেরি ঘর,
আমি তো এসেছি পর,
কেনরে বাঁধিলি মোরে স্নেহ মমতায়,
আমারে ডাকেনা কেউ "আয় কাছে আয়!"

৩

ভুলে আসিয়াছি আমি ভুলে চলে যাই,
তোদের এ দেবপুর,
আমার অনেক দূর,
হেথাকার রবি শশী মোর দেশে নাই;
এখানে চলিছে ভাসি,
আনন্দ অমৃত রাশি,
আমার সে ঘরভরা এক রা'শ ছাই;
ছেড়ে দে আমারে আমি অধম বালাই।

৪

বুকে বুকে জলে মোর চিতার অনল,
আমার বাতাসে হায়
বসন্ত পলায়ে যায়,
শুকায় আমার তাপে বরষার জল!
বেঁধে এক কুঁড়ে ঘর,
সবে ভাবি "পর পর"
ভরেছি আপনা দিয়ে বিশ্ব ভূমণ্ডল!—
পরের সহস্র দুখে,
"আহা"টী আসেনা মুখে,
পর লাগি চোখে নাই এক ফোঁটা জল,
মরমে মরমে শুধু
আগুণ জলিছে ধূধূ,
"সসাগরা ধরা" মোর মহা মরুস্থল!—
আমার কাহিনী তোরা কি শুনিবি বল?

৫

তোদের ও দেব-প্রাণ চির সুখময়,
নাই শোক নাই রোগ,
নাই "কপালের ভোগ"
জীবনে জড়া'ন নাই মরণের ভয়!
শুনিলে মধুর গীতি,
উছলে অমৃত-স্মৃতি,
চাহিলে মুখের পানে জুড়ায় হৃদয়;
তোদের স্নেহের ঘরে,
আনন্দ বিরাজ করে!—
এখানে আসিলে "পর" আপনার হয়,
এ বিশ্ব জগত ধরি
হৃদয়ে রেখেছ ভরি,
তাই ও পরাণে মরি, কেউ "পর" নয়;
তোদের ও দেব-প্রাণ নিত্য মৃত্যুঞ্জয়!

৬

তবু কি বাসিবি ভাল, স্বরগের মেয়ে,
তবু কি বাসিবি ভাল, দীন হীনে পেয়ে?—
ভালই বাসিবি যদি
এ মর মলিন হৃদি,
স্বরগ আলোক ঢালি দাও না গো ছেয়ে;
লইয়া তোদের হাসি
মুছিব এ অশ্রুরাশি,
আমারে ভুলিয়া রব কত "পর" পেয়ে!—
ব্রহ্মাণ্ডে বাঁধিব ঘর
কোথাও রবে না "পর"
ছুটিব অনন্ত-পথে হরিনাম গেয়ে;
আমারো আমারো লাগি
জগত উঠিবে জাগি,
আমিও অমর হ'ব সুধা-ধারা পেয়ে,
মোরে কি শিখাবি হ'তে "দেবতার মেয়ে"?

শ্রীপ্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

দুঃখমিলন।

১

বল দেখি কেন, বাল্যের বদন হেরি তোর,
স্মৃতিপথে আসে পুনঃ বাল্যের সে ঘুম ঘোর?
কত দিন দেখি নাই, বল কেন তবু ভাই
বাল্যের সে স্মৃতি গুলি ভাসিতেছে তোর মুখে,
কত দিন কত বর্ষ চলে গেছে সুখে দুখে,

তবু যেন সেই তুই পুরাণ ফুলিটী মোর,
লোকে বলে বাল্য চেয়ে বাড়িয়াছে দেহ তোর,
যে বড় বলেছে তোকে দেখুক নূতন চোকে,
পুরাণ দেখিছে তোরে কিন্তু আমার নয়ন;
কত ভাবে একেবারে উথলি উঠিছে মন।

২

কোমরে কাপড় বেঁধে দিতাম জলে সাঁতার,
জিদ করে একেবারে হতেম পুকুর পার!
তব জয় মম জয় সবই আনন্দময়
উল, স্কুল, গৃহকার্য্য উৎসাহে পূরিত প্রাণ,
প্রাতযোগিতার দোষ পেতনা হৃদয়ে স্থান.
সেই তুই সেই আমি তবে কেন আজ বোন
হেরিয়া আমাকে দুঃখে হয়েছ অধোবদন?
সেই বোন সেই তোরে সুদীর্ঘ দিনের তরে
বিদায় করিতে এসে পেয়ে অশ্রু প্রতিদান
ফিরিলাম গৃহে লয়ে আধভাঙ্গা হৃদিখান।

৩

ধরিয়া এ হাত দুটি সজল নয়ন ভরে
বলেছিলি "ভুলিস না এই ভিক্ষা মাগি তোরে।"
সেই হ'তে তোরে ভাই এক দিন ভুলি নাই,
কত দিন কত মাস কত বর্ষ ধীরে ধীরে
দুঃখেসুখে,হেসে কেঁদে গিয়াছে কাল সমীরে,
বাল্যের সাঙ্গনী তুই ছিলি সুখ সহচরী,
সুখের সময় তাই কাঁদিয়াছি তোরে স্মরি;
দুঃখের সময় সই ভুলিয়াছি তোরে কই?
হৃদয়ের দুঃখ যত রেখেছি হৃদয় ভরি,
দেখাইতে তোরে সব দ্বার উদ্ঘাটন করি।

৪

বহু দিন পরে আজ শুনাতে দুঃখকাহিনী
আসিয়াছি তোর ঠাঁই কেন তুই অভি-মানী?
ফুলেছে দুটি নয়ন কাঁদিয়াছ বুঝি বোন,
তোর কি আমারি মত হোরয়া স্বামীর মুখ
উথলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ের যত দুখ?
কেঁদনা কেঁদনা বোন দুঃখোচ্ছ্বাস রোধ কর,
আমিত কাঁদিনি তবে তুমি কেন কেঁদে মর?
সুখ দুঃখ যাহা পাও মঙ্গল বলিয়া লও,
লেগেছে তোমাকে তাই ভেবনা এ অমঙ্গল,
মঙ্গলময়ের ইচ্ছা সকলই সুমঙ্গল।

৫

জাননাকি কোন্ মহাজেতে জন্ম লয়েছ,
কোন্ মা'র গর্ব্ভে জন্মে এত বড় হয়েছ?
পবিত্র চরিত্রে যারা মোহিত করেছে ধরা,
চিরদিন সহিষ্ণুতা গুণে সুবিখ্যাতা;
বোন! সেই মহাজাতি হিন্দু নারী তোর মাতা।
মৃত পতি কোলে লয়ে নিশায় ঘোর কাননে,
প্রহারিতা সন্ত্রাসিতা লঙ্কার অশোক বনে,
পতিত্যক্তা বন মাঝে পতি খুঁজি ফিরিয়াছে,
শত পুত্র ঘাতককে পুত্র রূপে হৃদে ধরি,
সহিষ্ণুতা পরাকাষ্ঠা দেখায়েছে হিন্দুনারী।

৬

এই যে সংসার ক্ষেত্র পরীক্ষার স্থল ভাই,
উত্তীর্ণ হইতে গেলে সহিষ্ণুতা গুণ চাই।
ধুপ পুড়ে হুতাশনে তোষে বিশ্বে গন্ধ দানে,
কাঞ্চন পরীক্ষা লোক করিয়া থাকে অনলে,
মানব দেবতা হয় জানিত চরিত্র বলে।
সে চরিত্র সুপরীক্ষা হয় শোক দুঃখানলে,
না বুঝিয়া অমঙ্গল বলে লোক সুমঙ্গলে!
তাই বলি শোন বোন্ সান্ত্বনা করহে মন,
অতীতের শোক, দুঃখ জ্বালা সব ভুলি,
হাসিয়া বদন তোল শৈশবের ফুলি,
আগে কি কখন আর ভেবেছ স্বপনে,
দুঃখরাশি উথলিবে এ সুখ মিলনে?

শ্রীকুমুদিনী রায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৪ সংখ্যা।	পৌষ ১২৯৮—জানুয়ারী ১৮৯২।	৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বন্ধু হস্ত হইতে রক্ষার প্রার্থনা—স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রের কলে ১১ ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে পারিবে না, এই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমেদাবাদের শ্রমজীবিনী রমণীগণ তাহার অন্যথার জন্য কাতরোক্তিপূর্ণ প্রার্থনা বোম্বাইয়ের গবর্ণরের নিকট অর্পণ করিয়াছেন। রাজব্যবস্থায় এদেশের কলের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখিনী স্ত্রীলোকদিগেরও উপার্জ্জনের যে ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। বিলাতের তাঁতিদের লাভের জন্য প্রজার ক্ষতি করা রাজধর্ম্ম নহে।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষা দিয়া নিম্নলিখিত তিনটী পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং প্রত্যেকে ৮০০০৲ টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেনঃ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ও যে, হুইলার। আজিও কোন রমণী এ পরীক্ষার প্রতিযোগিনী হন নাই!

লর্ড ডফারিণের পদ বৃদ্ধি—তিনি রাজদূত হইয়া ৭০০০ টাকা বেতনে রোমে কার্য্য করিতেছিলেন, এখন ৯০০০ টাকা বেতনে পারিসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভারত-হিতৈষিণী লেডী ডফারিণের সৌভাগ্যে আমরাও সুখী।

লর্ড লিটনের মৃত্যু—আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন সম্প্রতি ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। পারিসের ইংরাজ চর্চ্চে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উপাসনায় অনেক বড় বড় লোক উপস্থিত হন, রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হয় এবং পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলো-

নাজ সৈন্যদল তাঁহার মৃতদেহের সম্মাননা রক্ষা করে।

লোকসংখ্যা গণনা।—সেন্সসের বিবরণ এখনও পূর্ণাবয়বে বাহির হয় নাই। কয়েক স্থানের লোকসংখ্যা যেরূপ জানা গিয়াছে, প্রকাশিত হইলঃ—বোম্বাই প্রদেশে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ, সিন্ধু ২৮ লক্ষ ৭২ হাজার, আজমীর ৫ লক্ষ ৫২ হাজার, পঞ্জাব ব্রিটীষাধিকৃত ২ কোটি ও মিত্ররাজ্য ৪২ লক্ষ, বেরার ২৯ লক্ষ, আসাম ৫৪ লক্ষ, আন্দামান ১৫৬০৯, মহীশূর ৫০ লক্ষ, কাশ্মীর ২৫ লক্ষ।

উদাসীনের চিন্তা।

পুণ্যের জয়।

ঘোষদের বাড়ী বিবাহ। কমল কামিনী দশ দিন পূর্ব্বেই স্বর্ণকারের বাড়ী স্বর্ণ পাঠাইয়াছেন। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে কমলকামিনীর স্বামী শিশির বাবু স্বর্ণকারের বাড়ী ছুটিয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণকার বেচারী ছোট লোক, কথা ঠিক্ রাখিতে পারে নাই। শিশির বাবু নিরুপায় হইয়া বিরসবদনে ফিরিয়া আসিলেন, এদিকে কমলকামিনী আশার কুহকে পড়িয়া মনে মনে কত জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। কোথায় কোন্ গহনা খানি কিরূপ বসাইবেন, নিমন্ত্রিত অন্যান্য মহিলাগণ অলঙ্কারের কে কিরূপ সমালোচনা করিবেন, তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় শিশিরকুমার নিদারুণ সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কমলকামিনীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। ভগ্ন আশার শোক অসহ্য হইয়া উঠিল। শোকাশ্রু গণ্ডদেশ প্লাবিত করিল। শিশির কুমার দেখিলেন বড়ই বিপদ। তিনি অলঙ্কার ঋণ করিবার জন্য প্রতিবেশী বন্ধু শরৎ বাবুর বাটীতে দৌড়িলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও অকৃতকার্য্য হইলেন। তৎপরে বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু মিলিল না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কমলকামিনী মনে মনে কখন স্বামীকে, কখন বা অদৃষ্টকে দোষী করিতে লাগিলেন। যাহাহউক তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে ভিখারিনীর বেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন না। শিশির কুমার কত বুঝাইলেন, কত অনুরোধ করিলেন, ভাবিষ্যতে কত বেশ ভূষার প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কমলকামিনীর সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। বেলা যখন দ্বিপ্রহর, যখন প্রতিবেশী অন্যান্য মহিলাগণ বেশ ভূষা করিয়া বিবাহ বাড়ীতে যাত্রা করিলেন, তখন কমলকামিনীর শোকের তরঙ্গ আবার

উপলিয়া উঠিল। এবার একটু উচ্চৈঃস্বরেই কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী ভগিনীদিগের দুই চারিজনের অনুরোধে অবশেষে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহাদিগের অনুগমন করিলেন। বিবাহ বাড়ীর অন্তঃপুর মহিলাবৃন্দে পরিশোভিত হইল। প্রায় সকলেই সাজ সজ্জা করিয়া আসিয়াছেন, কেবল আসেন নাই কমলকামিনী। মিথ্যাবাদী নিষ্ঠুর কর্ম্মকার ইহার কারণ। আর আসেন নাই বিভাবতী। কারণ তাঁহার স্বামী দরিদ্র, পঁচিশ টাকা বেতনভোগী একজন কেরাণী। ইনি অতি কষ্টে দারিদ্র্যের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। জঠর জ্বালা নিবারণ করিয়া পত্নীকে দুই চারি খানি অলঙ্কার, কি এক খানি মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করিয়া দেন, এমন সাধ্য তাঁহার নাই। তাই বিভাবতী সন্ন্যাসিনীর মত অতি সামান্য বেশভূষা করিয়া আসিয়াছেন।—বাবুর স্ত্রী সরোজিনী এখনও আসেন নাই। বেশভূষার জন্য তিনি মহিলাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায় ধুমধামের উৎসবেই দুই এক খানি নূতন রকমের অলঙ্কার পরিধান করিয়া উৎসব বাড়ীতে উপনীতা হন। আজ তিনি কোন্ সাজে উপস্থিত হইবেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সকলেই ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময় একটি বালিকা সংবাদ দি[illegible]—বাবুর স্ত্রী আসিয়াছেন। ঘোষ পরিবারের গৃহিণী তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কারণ সরোজিনী সমাজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সম্ভ্রান্ত মহিলা-সমাজের সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকেন। এ সম্মান তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ধন নহে; তাঁহার স্বামী ধনী এবং জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং সরোজিনী স্বামীর গুণে সর্ব্বত্র আদৃতা। যাহাহউক যখন সরোজিনী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্। আজ সামান্য এক খানি শাড়ী পরিয়াছেন। অলঙ্কার নাই বলিলেই হয়। অতি দীনবেশে উপস্থিত হইয়াছেন। অথচ বদনমণ্ডলে বিরসতার চিহ্ন মাত্র নাই, হাস্যপ্রফুল্ল মুখ। সকলেই এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া কারণ জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই প্রথমে মুখ ফুটিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে এক বর্ষীয়সী মহিলা তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা আজ এ বেশে কেন? তোমার আর কি এ বেশ শোভা পায়? তোমার ত কিছুরই অভাব নাই। যাদের কিছু নাই, ভাত থাকিতে কাপড় নাই, কাপড় থাকিতে ভাত নাই, তাহাদের এ গরিবের বেশ সাজে। তুমি ধনীর মেয়ে, তা বড় ধনীর হাতে

পড়েছ, তুমি সোনা হীরায় জড়িত হইবে, তুমি কেন কাঙ্গালীর বেশে এসেছ?"

দ্বিতীয় বর্ষীয়সী—"এখন এর পয়সার দিকে চোখ পড়েছে। দেখ্‌বে দুদিন পরে বাস্তহারী হবে। কৃপণতার হদ্দ। তা না হলে কি আর এরূপ হয়। এদের বয়সে আমরা কত পরেছি, ভাই এদের কথা ছাড়িয়া দাও। এদের বাকৃস বোঝাই করার চেষ্টাই অধিক।"

গৃহকোণে বসিয়া সরলা বিমলাকে বলিতেছে "ভাই জান, সরোজিনীর ওসব কি? ওসব বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। বৈরাগ্যের জ্বালায় অস্থির হলেম।"

বিমলা—"হাঁ ভাই। কতকগুলা ভণ্ড লোকের জ্বালায় জ্বালাতন হলেম। আমাদের গয়না গুলি যেন তাঁদের চোখের শূল। যখনই একটু সাজগোজ করি, তখনই তাঁহারা আক্রমণ করেন। যেন এসংসারে সকলই তাঁদের বাড়ীর গিন্নিদের মত সৃষ্টিছাড়া মেয়ে হবেন। ভাই তাহাদের সভাতে "বৈরাগ্য চাই, বৈরাগ্য চাই' বলিয়া চীৎকার করেন। কাগজে বৈরাগ্য বিষয়ে যেরূপ লেখেন, এতে অনেকের মন সে দিকে ঝুকিতে পারে। যাক্‌ ভাই, আমি কিন্তু তাঁদের সেকথায় মন দিই না, যারা দুর্ব্বল তাঁরাই পরের কথায় নাচিয়া থাকে। আমাকে দিয়া হবে না।"

সরলা—ভাই! ঠিক্‌ বলেছ। কিন্তু আর এক কথা, যাঁরা বৈরাগ্য প্রচার করেন, তাঁদের ত তেমন কিছু দেখতে পাই না। নিজের সার্টেতে সোনার বোতাম, পায়েতে উলের মোজা বুট, চোখে সোনার ফ্রেমওয়ালা চসমা, মেয়েদের গায়ে সোনা রূপার গয়না, বেনারসী সাড়ী। তবে প্রকৃত বৈরাগী ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। লক্ষ টাকার অধিকারী হয়েও পায় কখনও চটিজুতা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। গায়ে এক খানি লাংক্লথের চাদর। কোথায় তাঁর মত লোক ত আর দুটি দেখতে পাই না। কথায় বৈরাগ্যের প্রচার অনেকেই কত্তে পারে, ও আমরাও পারি। কাজের বেলায় ত সকলেই পিছ পা।"

বিদ্যাসাগরের নাম শুনিয়া সরোজিনী সেদিকে চলিয়া গেলেন এবং সরলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবনচরিত পাঠ করিয়া আমার মন কেমন হইয়াছে। তুমিও ত তাঁর প্রশংসা কল্লে, তবে আমায় ঠাট্টা করিতেছ কেন? তুমি যা ভাল বল্লে, তা যদি কেহ করে তা'হ'লে তোমার তার নিন্দা না করে প্রশংসা করাই উচিত।"

সরলা—"হা বিদ্যাসাগর হয়েছেন কিনা? তাই সাজ গোজ করেন না! কাল ছিলেন রাজরাণী, আজ হ'লেন ভিখারিণী। দুদিন যাক সব দেখ্‌তে পাব।"

একথা শুনিয়া সরোজিনীর মনে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই চতুর্দিক হইতে তীব্র

সমালোচনা শুনিয়া মনে মনে আপনাকে দুই একবার তিরস্কার করিতেছিলেন। বেশ ভূষা পরিত্যাগ না করিলে তাঁহার এরূপ কথা শুনিতে হইত না, ভাবিয়া দুই একবার মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে আর ওরূপ করিবেন না। বাস্তবিক মানুষ লোক-নিন্দার ভয়ে যেরূপ অনেক সময় অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ কখন কখন কোন কাজকে সৎ বলিয়া বুঝিয়াও তাহা করিতে সাহসী হয় না—কখন সাহসপূর্ব্বক কাজ করিয়া পুনর্ব্বার পশ্চাৎপদ হন। সরোজিনীর দশা ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। জাঁকাল রকমের বেশভূষা করা যে অন্যায়,সরোজিনী তাহা বুঝিয়াই উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশিনীদিগের সমালোচনায় বিষাক্ত বাণে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার মনের সাধুভাব যেন একটু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। সরোজিনীর মনে এখন ঘোরতর সংগ্রাম। সাধুপ্রবৃত্তি তাহাকে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইবার জন্ত উত্তেজিত করিতেছিল। এদিকে লোক-প্রশংসা প্রিয়তা কর্ত্তব্য সাধনের পথে দুরলঙ্ঘ্য গিরির মত দণ্ডায়মান। সরোজিনী মনে মনে একবার অগ্রসর হইতেছেন, একবার ভয়ে ভীত হইয়া নিরস্ত হইতেছেন। হঠাৎ কবির সেই জলন্ত কবিতাটী তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। অমনি মনে আওড়াইলেন :— "কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা জীবনে পালিব তাহা, থাকে থাকে যায় যাক ধন প্রাণ মানরে, পিতারে ধরিয়া রব পর্ব্বত সমানরে।" গভীর অমানিশিতে নির্জ্জন কান্তারে পথভ্রান্ত পথিক দীপ হস্তে একজন চালককে পাইলে যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, ঘোরতর সংগ্রামে শক্তিশূন্য হইয়া পরাস্তপ্রায় সেনাপতি নিকটে সাহয্যার্থ সমাগত সৈনিক সমূহের কোলাহল শুনিয়া যেরূপ আশস্ত হয়, নিরাশার হস্তে সমর্পিতা সরোজিনীর প্রাণে এই কবিতাটি যেরূপ আশার আলোক আনিয়া দিয়াছিল। সরোজিনী তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "লোকে যাহাই বলুক না কেন, কখনও সাধুসঙ্কল্প হইতে বিচ্যুতা হইব না।" তিনি এ সময়ে প্রাণে আর এক নবতেজ প্রাপ্ত হইলেন। সংস্কারক সত্যের আলোক লাভ করিয়া প্রাণে যে তেজ পান, এ তেজ সেই তেজ। কে যেন অন্তর হইতে বলিল, সরোজিনী কেবল আত্ম-রক্ষা করিবার প্রয়াসী হইও না, মহিলা-দিগের প্রাণে তোমার সাধুভাব প্রেরণ করিতে সচেষ্ট হও।" কোথা হইতে এই আদেশ প্রচারিত হইল, সরোজিনী তাহা কিছু বুঝিল না। কিন্তু তদবধি তাহার জীবনের ব্রত যেন অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সকল কাজের মধ্যে যেন এ ভাব তাঁহার জীবনে জাগরূক। সকল কার্য্য এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত নিয়মিত হইতে লাগিল। তখন সরোজিনী আর ইচ্ছা করিয়াও পূর্ব্বভাব

আনয়ন করিতে পারিতেছেন না! যে অলক্ষ্য শক্তি অনন্ত বিশ্বকে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চালাইয়া লইতেছেন, সে শক্তি অন্তরালে থাকিয়া সরোজিনীর জীবনের সমস্ত কার্য্য কলাপ নিয়মিত করিতেছিল। যিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি সাধুতার আশ্রয় এবং অসাধুতার বিনাশক, তিনিই সরোজিনী দ্বারা এক মহা সত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে দুর্দ্দম তেজ ও অমেয় বল আনয়ন করিতেছেন, যে বল প্রাপ্ত হইয়া সরোজিনী লোক প্রশংসাকে তুচ্ছ করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, যে বল লাভ করিয়া সরোজিনী বহুমূল্য বেশ ভূষায় অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনের প্রবল ইচ্ছাকে অনায়াসে দূরাপনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন্ অনির্ব্বচনীয় অনন্ত উৎস হইতে এই বল ও তেজ আসিয়াছিল সরোজিনী প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু কালক্রমে সরোজিনীর মোহের যবনিকা অপসারিত হইল। বিশ্বাসের আলোক দ্বারা সরোজিনী তখন সেই অনন্ত মহাপুরুষের মঙ্গলময় বিধান বুঝিতে সমর্থা হইলেন। যতই তাঁহার শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণে অধিকতর বল সঞ্চিত হইতে লাগিল এবং দুর্দ্দম উৎসাহের সহিত মহিলা সমাজে বেশভূষার অসারতা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনেক মহিলা অকিঞ্চিৎকর বেশভূষার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রদিগের দুঃখ বিমোচনের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। যে কমলকামিনী অলঙ্কার অভাবে ক্ষুব্ধা হইয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন, তিনিও পরিবর্ত্তিত হইলেন। তিনি সরোজিনীর একজন সহকারিণী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন এবং ক্রমে আরও অনেক রমণী ইঁহাদিগের দলভুক্ত হইল।

বিপ্লব ও সমালোচন।

নবযুগ প্রাচীন যুগের উত্তরাধিকারী। প্রাচীন যুগের প্রথা পদ্ধতি আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি নবযুগের স্কন্ধে দেশে। জগৎ উন্নতিশীল; প্রতি নিয়ত উন্নতির পথে ধাবিত হইবার জন্য সকল যুগেরই অবিশ্রান্ত চেষ্টা। কিন্তু প্রাচীন যুগের প্রথা পদ্ধতির ভার, নবযুগের গতির বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীনার অলঙ্কার রাশি, নবীনার শোভা বর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, বরং পীড়াদায়ক বোঝা হইয়া পড়ে। সুতরাং নবীনার পক্ষে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যজ্ঞাপক বেশ, শারীরিক ও মানসিক ক্লেশদায়ক এবং বর্ব্বর রুচির পরিচায়ক ভূষণ রাশি অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রতি নবযুগের সমাজ

বিপ্লবে প্রথমতঃ গঠন অপেক্ষা ধ্বংস অধিক, সৌন্দর্য্য সংস্থাপন অপেক্ষা নীরস পবিত্রতা বিধান অধিক। যাহা এক যুগের উন্নতির স্বরূপ ছিল, তাহা অন্য যুগে নিতান্ত নিষ্প্রোয়জনীয় হইয়া দাঁড়ায়। পুষ্পদল ফল বিকাশের হেতু-ভূত; কিন্তু ফলবৃদ্ধি সময়ে, পুষ্পদল যদি ঝরিয়া না পড়িত, তবে ফল বিকাশের উন্নতি হইতে পারিত না। কিন্তু একটী বিষয়ে নবযুগের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন। কোন্‌টি তাহার উন্নতির বাধক, এবং কোনটি তাহার উন্নতির অনুকূল, তাহা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করা চাই। পুষ্পের দল ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু উপপত্র বা উপদল, অনেক সময়ে ফলের সহিত সংলগ্ন থাকে। যদি ঐ উপদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইত, তবে ফলের বিকাশ সাধন বিষয়ে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইত। সুতরাং কাহার কি কার্য্য অনুধাবন করিয়া না বুঝিয়া লইলে, বিপ্লব-যুগে অনেক মহানিষ্ট সাধিত হয়। ধর্ম্ম বিশ্বাস বা ঈশ্বর প্রত্যয়, সমাজস্থিতির মূলভিত্তি; কিন্তু অন্যান্য কুসংস্কারসহ, যখন এই ধর্ম্মভাব, রাষ্ট্রবিপ্লবকারীদিগের তরবারির আঘাতে বিনষ্ট হইল, তখন পারিস নগরী বার-বনিতার পদতলে দলিত হইয়া উন্নতির নামে, ঘোর পৈশাচিকতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিপ্লব ও পরি-বর্ত্তনের পূর্ব্বে অপক্ষপাতী গভীর দৃষ্টিতে প্রাচীন রীতি নীতি প্রথা পদ্ধতি প্রভৃতি সমালোচিত হওয়া চাই।

বলা বাহুল্য যে বিদেশাগত নবভাব তরঙ্গের আভঘাতে, এদেশের অনেক প্রাচীন সংস্কার চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। উন্নতিপ্রয়াসী নব্যসম্প্রদায়, পদে পদে প্রাচীন ভাবের বাধা অনুভব করিতেছেন; এবং কোথাও কোথাও বা উন্নতির পথের আবর্জনা বিবেচনা করিয়া অনেকে অনেক প্রাচীন প্রথা, বিদূরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা এই অবশ্যম্ভাবী আসন্ন বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনকে বাধা দিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ইতিহাসানভিজ্ঞ ও বাতুল। উন্নতি কালের ধর্ম্ম; এবং উন্নতি বা বিকাশ অর্থই পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তন ও উন্নতি আবার গতি-সাপেক্ষ; এবং বিজ্ঞানে গতি ও তাপ সমার্থবোধক। সুতরাং এই উন্নতিতে যে তাপ সঞ্জাত হইবে তাহা অনিবার্য্য। যাহারা প্রাচীনতার অন্ধকার মধ্যে ডুবিয়া আছে, তাহাদের চক্ষে নবা-লোকের দীপ্তি অসহ্য হইবেই হইবে; এবং সহস্র হাহাকার ও প্রতিকূলাচরণ সত্ত্বেও, অচল প্রাচীন গৃহ ধূলিসাৎ হইবে এবং তৎ স্থানে, নবগৃহ মস্তক উত্তোলন করিবে। সুতরাং যাঁহারা বাধা দিতে প্রয়াসী, তাঁহারা আত্মঘাতী মাত্র। বাধা না দিয়া বরং যাহাতে উন্নতিপ্রয়াসীদিগের কার্য্যে হটকারিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষ না স্পর্শে, তাহার

জন্ত অবিশ্রান্ত চেষ্টা করা চাই, নিরপেক্ষ ভাবে প্রাচীনের দোষ গুণ সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেখা চাই এবং দেখান চাই।

এইজন্তই পরিবর্ত্তন যুগে সমালোচনা বড় প্রয়োজনীয়। একজন ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছেন যে প্রকৃত সমালোচনার অর্থ "To see things as they are"—অর্থাৎ যে যাহা তাহাকে ঠিক্ সেই স্বরূপে দেখা এবং বোঝা। আমাদিগের দেশে যদি কোন কিছুর অভাব থাকে, তবে এই সমালোচনার সম্পুর্ণ অভাব আছে বলিতে পারি। আত্মাভিমান, জাত্যাভিমান, অন্ধ দেশ-হিতৈষণা, পরবিদ্বেষ, অনভিজ্ঞতা, মূর্খতা প্রভৃতির চাপে, চিত্তের সুব্যবস্থিত ভাব, দৃষ্টির সমতা, এবং বিচারের গাম্ভীর্য্যের অনেক ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতি, আমরা আবার কোনও অংশে ইংরাজদিগের অপেক্ষা হীন, একথা প্রাণান্তেও স্বীকার করিতে চাই না। ইংরেজের কোন কোন গুণ যে আমাদের বিশেষ অনুকরণীয়, তাহা দেখিতে পাই না। আমাদের সমাজ মধ্যে যে কত কুসংস্কারের বিষবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহা আদৌ জানি না। পরের ভাল গ্রহণ করিবার শক্তি নাই; অথচ চিত্তের অব্যবস্থিত ভাবের ফলে, অনেক সময়ে প্রবৃত্তির অনুরোধে বা তাড়নায়, অন্যের যাহা মন্দ তাহা গ্রহণ করিয়া ফেলি, এবং নিজের যাহা মঙ্গলপ্রদ, তাহা পদতলে বিদলিত করি। অনেক সময়ে আমরা পরের যাহা যাহা অনুকরণ করি, বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, যে প্রবৃত্তির উত্তেজনায়, যখন বুদ্ধির জড়তা উপস্থিত হইয়াছিল সেই সময়েই সেই গুলি গ্রহণ করিয়াছি। মার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া অনুকরণ করিতে গেলে, ফল অন্তরূপ হইয়া পড়িত। যখন বুদ্ধি জাগরূক থাকে, তখন বৃথা অভিমান বা একটা কল্পিত দেশহিতৈষণার ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অনুকরণ দূষ্য মনে করি; কিন্তু বুদ্ধির মূঢ়াবস্থায় যখন প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হই, তখন আর নিজের কার্য্যের উপর নিজের কোন প্রভাব থাকে না। তাই অজ্ঞাতসারে আর্য্যজাতির আড়ম্বরশূন্যতা এবং চিত্তসংযম পদদলিত করিয়া আমরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া পড়িতেছি; এবং অন্য জাতির উদ্যম এবং কার্য্যশীলতা, বণিকজনোচিত বা হীনজাতির উপযোগী বলিয়া বৃথা জাতিকুলের বড়াই করিয়া, দিন দিন দারিদ্র্য সাগরে ডুবিতেছি। চিত্তের যে সমতা সমালোচনার জন্য প্রয়োজন, তাহা যে সমাজে জন্মিতে পারিতেছে না, সেখানে উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

যদি কেহ আমাদের সমাজের কোন দোষ দেখাইয়া দেয়, আমরা কদাচ সেই দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখি না বাস্তবিকই সেটি

দোষ কি না; বরং সে দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া অন্য সমাজের কত দোষ আছে তাহারই একটা গভীর গণনায় প্রবৃত্ত হই। ইহাতে লাভ তো কিছুই নাই; অতিরিক্ত লোকসানের ভাগ দ্বিগুণ। প্রথমতঃ আত্মদোষের প্রতি অন্ধ হইয়া আপনার উন্নতির মূলে আপনি কুঠারাঘাত করা হয়; দ্বিতীয়তঃ পরদোষ দর্শন ও পরদোষ কীর্ত্তনের ফলে চিত্তের ভয়ঙ্কর নীচতা জন্মিয়া উঠে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আমরা আত্মদোষ দর্শনে বিমুখ নহি; তবে অন্য জাতি যদি আমাদের দোষের কথা উল্লেখ করে, তবে তাহা বড় অসহ্য হইয়া উঠে। রাগ করিয়া তাহাদের দোষ দেখাইতে প্রবৃত্তি হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য অভিলাষ হয়। ইহারই নাম চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া। যদি তোমার অন্তঃকরণে বাস্তবিকই উন্নতি লাভের ইচ্ছা থাকিত, তবে তুমি দোষ প্রদর্শনকারীকে পরমবন্ধু ভাবিয়া তাঁহার কাছে বরং কৃতজ্ঞ হইয়া আত্মত্রুটী সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে। কিন্তু তোমার আচরণ যখন বিপরীত, তখন তুমি মুখে যাহাই বল, তোমাকে মূর্খ এবং অর্ব্বাচীন ভিন্ন কেহ আর কিছু বলিবে না। স্থিরচিত্তে, স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে, এবং প্রবল উন্নতির ইচ্ছা পোষণ করিয়া যিনি সামাজিক রীতিনীতির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। অমুক প্রথা দেশীয়, অমুক প্রথা বিদেশীয়, অমুক প্রথা প্রাচীন, অমুক প্রথা নবীন, একথায় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সংকীর্ণচেতার কর্ম্ম। অবলম্ব্য প্রথা ভাল কিনা ইহারই বিচার করা চাই। যদি ভাল হয়, তবে বিদেশীয় বা নূতন বলিয়া উপেক্ষিত হইবে কেন? যদি মন্দ হয় তবে দেশীয় বা প্রাচীন বলিয়া রক্ষিত হইবে কেন? স্থির দৃষ্টিতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে এই মাত্র। তাহার পর তোমার অনুষ্ঠানে প্রাচীন ভাঙ্গিল, কি নবীন গঠিত হইল; দেশের মর্য্যাদা রক্ষা পাইল, কি বিদেশের গৌরব বৃদ্ধি হইল, সে কথা আদৌ চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার একমাত্র লক্ষ্য কর্ত্তব্যপালন, তাহাতে পৃথিবী তোমার অনুকূল হউক বা প্রতিকূল হউক তাহা গ্রাহ্য করিও না। তবে তোমার উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ যেন হঠকারিতা বা উষ্ণমস্তিষ্কতার দ্বারা না হয়। সর্ব্বদা সাবধানে চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে এবং স্থিরচিত্তে তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া সামাজিক দোষগুণের বিশেষ সমালোচনা করিবে। এ কার্য্যে সর্ব্বদা অকুতোভয় হইতে হইবে এবং মনে রাখিও যে যিনি ন্যায়পথের দিকে অগ্রসর হয়েন, বিধাতা তাঁহার নিত্য আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকেন। একটি প্রাচীন কবিতায় আছে যে—

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদিবা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্,
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা,
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

নীতিবিশারদেরাঃ নিন্দাই করুন বা প্রশংসাই করুন, ধনাগমই হউক অথবা দারিদ্র্যই হউক, অদ্যই মৃত্যু হউক বা আর এক যুগ পরে হউক, ধীর ব্যক্তিগণ এসকল চিন্তা উপেক্ষা করিয়া থাকেন এবং কদাচ ন্যায়পথ হইতে বিচ্যুত হয়েন না।

বি, ম।

বিবী গ্রিমউড।

ব্রিটন-ঈশ্বরী কেন সমাদরে,
'রয়াল রেডক্রস' তব বক্ষ পরে,
পরাইছে আজ?—রমণী-সমাজ,
কেন উল্লসিত স্মরি তব কাজ?
বীরাঙ্গনা বলি—সমস্ত ব্রিটনে,
পূজিছে তোমায় কেন কায়মনে?
যে বীরত্ব তুমি দেখাইলে সবে,
সে বীরত্ব আর কাহারে সম্ভবে?
বীরজাতি মাঝে জনম তোমার,
যে জাতির যশ সর্ব্বত্র প্রচার।
বীর দাপে যাঁর কাঁপে বসুমতী,
অবনতশির কত নরপতি—
যে ব্রিটন কাছে—তাঁহার গৌরব,
বাড়াইলে তুমি দিয়ে অভিনব
অলঙ্কার এক—অমূল্য রতন—
অসম সাহস—অতুল বিক্রম!
মণিপুর হতে—হাঁটিয়ে কাছার,
রমণী হইয়ে গেলে কি প্রকার?
লঙ্ঘিলে কিরূপে সে দুর্গম পথ,
শ্বাপদসঙ্কুল পাহাড় পর্ব্বত?
যতবার শুনি—অদ্ভুত কাহিনী,
আতঙ্কে শিহরি উঠি যে অমনি!
ভাবিয়ে অবাক্—রমণীর কাজ,
বীরেরাও হেরি পায় মহালাজ!
কে দেখাবে হেন বীরত্ব আর?
সন্তান যেমন পাইলে জননী,
আহত সৈন্যেরা তোমারে তেমনি,
পেয়ে সন্নিকটে—বিষম সঙ্কটে,
গিয়েছিল ভুলি সে গিরি-সঙ্কটে।
ঘোর বিপদেও অটল-নির্ভয়,
ধন্য ধন্য ধন্য রমণী-হৃদয়।
সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ,
নিয়োজিত যেন নারীর পরাণ।
ভুলি স্বার্থ সুখ—পরের কারণ,
নারীবিনে কেবা করিবে পালন,
সেই মহাব্রত—পর উপকার;
কে আছে এমন নিঃস্বার্থ উদার!
দয়ার প্রতিমা—স্নেহের পুতলি,
কোমল হৃদয়—দুঃখে যায় গলি।
ঘুচাইতে বুঝি অবনীর ভার,
সৃজিলা নারীরে—সৃষ্টির আধার।
শিরায় শিরায় দিলা স্নেহরস,

কে দেখেছে কবে নারীরে কর্কশ!
জানেনা সে কারে কঠিনতা কয়,
দয়াগুণে তাঁর বিশ্ব পরাজয়!
সংসার-উদ্যানে স্বর্গ পারিজাত,
দুঃখের আঁধারে সুখ-সুপ্রভাত।
সৌন্দর্য্যের সার-গুণের গরিমা,
মিলে কি জগতে নারীর উপমা?
অতুলনীয়া নারী এ জগতে।
সত্য বটে তুমি হারায়েছ সব
ইহ সংসারের আনন্দ উৎসব।
ভাঙ্গিয়াছে এবে সুখের স্বপন
(স্বপন সফল হয় কি কখন?)
ঘেরিয়াছে ঘোর নিরাশা আঁধারে
আশার আলোক নাহি এসংসারে।
অতুল সম্পদে ছিলে মণিপুরে,
অস্থায়ী সে সুখ গেছে তাই দূরে।
দাসদাসী সেথা ছিল অগণন,
কোথায় সে সব গিয়েছে এখন?
কাটিতেছ দিন হয়ে ভর্ত্তৃহীন,
বৈধব্য-যাতনা দুর্দ্দশা দুর্দ্দিন
পেষিছে তোমারে—সদা-অনুক্ষণ,
দুখের সাগরে রয়েছ মগন।
কিন্তু ভেবে দেখ চিরদিন কার
একভাবে যায়!—অনিত্য সংসার।
ওই দেখ চেয়ে—রাজপরিবার
অদৃষ্টের চক্রে ঘুরি অনিবার
কর্ম্মফল ভোগ করিছে কেমন?
সহস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে এমন।
নিয়তির করে নাহিক নিস্তার,
কেবা রাজা প্রজা সব-একাকার,
আজ যে উত্থিত সম্পদ শিখরে,
কাল সে কাতর মুষ্টি ভিক্ষা তরে।
আজ যে বিপুল বৈভবের স্বামী,
কাল সে বিপত্তি সাগরেতে নামি
বহিছে দুঃখের অতি গুরু ভার,
শ্মশান সমান সুখের সংসার।
কিন্তু ভেবে দেখ বলি আর বার
চিরদিন যায় সুখেতে কাহার?
অদৃষ্টের ভোগ ভুগিতে হয়।
বীরাঙ্গনা বলি দেখ কি প্রকারে—
সমস্ত জগত পূজিছে তোমারে,
তব বেদনায় ব্যথিত সকলে।
'কণ্ডোলেন্স লিপি' ওকরকমলে
আসিয়াছে কত সংখ্যা নাহি তার।
হিমালয় হতে কুমারিকা পার—
সমস্ত ভারত শোকেতে মগন
তোমার কাহিনী করিয়ে শ্রবণ।
য়ুরোপ এশিয়া আমেরিকা সব,
পরিহরি সুখ আনন্দ-উৎসব,
ভাসিতেছে সবে নয়নের জলে;
হত্যাকাণ্ড কথা শ্রবণ যুগলে
পশেছিল যাই, পাষাণ হৃদয়
গলে গিয়াছিল হয়ে দ্রবময়!
আজিও স্মরণে বিদরে বুক।
যে বীরত্ব তুমি দেখাইলে ভবে
সে বীরত্ব বল কজনে সম্ভবে?
ইহ কালে তার নাহি পুরস্কার;
স্বর্গে যবে যাবে ছাড়ি এসংসার,
তোমার জননী যতনে আদরে
চুম্বন করিয়ে ডেকে লবে ঘরে!
শোক-তাপ দুঃখ ঘুচাইবে সব
আবার দিবেন আনন্দ উৎসব।

সোণার কিরীট পরাইয়া শিরে,
বসাইবে তায় মণি মুক্তাহীরে।
বসনে ভূষণে সাজাইয়ে কায়,
রত্ন সিংহাসনে বসাবে তোমায়,
বীরাঙ্গনা যত রমণী পাশে।

শ্রীচ।

সত্য-পরায়ণতা।

১-শক্তসিংহ।

স্বদেশবৎসল বীরবর প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় যে দিন মিরাররাজ-পুরোহিত সেই বিবাদজনিত অনর্থ বুঝিতে পারিয়া শাণিত ছুরিকা দ্বারা স্বীয় হৃৎপিণ্ড ছেদন পূর্ব্বক আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন—যে-দিন তাঁহার পূত শোণিতে সিক্ত হইয়া পৃথিবী আপনাকে পবিত্রা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই দিন রাজা প্রতাপ-সিংহের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহা-দের ভ্রাতৃদ্বয়ের এই বিবাদই হিতৈষী পুরোহিতের মৃত্যুর কারণ, এবং তজ্জন্য তিনি ক্রোধারক্ত নয়নে শক্তসিংহকে বলিলেন যে "তুমি আমার অধিকার হইতে দূর হও।" শক্ত অগ্রজের সেই কঠোরাদেশ শ্রবণেপ্রতিহিংসার্থে মোগল-পতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তদবধি শক্তসিংহ প্রতাপের ঘোর শত্রুরূপে পরিণত হইলেন, এমন কি যখন হলদি-ঘাটের ঘোর সংগ্রামে প্রতাপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও শক্ত অগ্র-জের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য প্রকাশ করেন নাই, বরং প্রাণপণে বৈর-সাধনেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

যখন প্রতাপসিংহ একাকী সেই রণ-স্থল পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তখন দুইজন মোগল সৈনিক অশ্বারো-হণে প্রচ্ছন্নভাবে প্রতাপের অনুসরণ করিল। এই দুইজন সৈনিকের মধ্যে এক জন খোরাসানী, অপর ব্যক্তি মূলতানী। প্রতাপ, পশ্চাদ্ধাবিত সৈনিকদ্বয়ের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। তিনি শোণিতাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার প্রিয়তম অশ্ব চৈতকও অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি সে স্বীয় প্রভুকে বহন করিয়া দ্রুতবেগে চলিতেছে। শক্তসিংহ মোগলবাহিনীর মধ্যে থাকিয়া এই সমস্ত দর্শন করিতে-ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ক্ষণিক পূর্ব্বে যিনি জ্যেষ্ঠের হৃদয় শোণিত দ্বারা বিদ্বে-

বানল নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখন তিনি স্বদেশবৎসল বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে শোণিতসিক্ত, ক্ষতাঙ্গ, নিঃসহায়, পলায়নপরায়ণ, বিপন্নজীবন ও স্বাধীনতাভ্রষ্ট দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, তাঁহার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। তিনি তেমন স্বদেশানুরাগী ভ্রাতার পরম শত্রু, আর তেমন বিপন্নাবস্থায়ও ভ্রাতার প্রতি কিছুমাত্র আনুকূল্য প্রদর্শন না করিয়া কেবল তাঁহার জীবন ও স্বাধীনতা বিনাশের চেষ্টা করিয়া মাতৃভূমির সর্ব্বনাশে সমুদ্যত, এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় যাতনা প্রদান করিতে লাগিল, তিনি অনুতাপে অধীর হইয়া পড়িলেন। বিপন্ন ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বারোহী মোগলসৈনিকদ্বয়কে ধাবিত দর্শনে তাঁহার কঠিন হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি আর এখন প্রতাপের শত্রু থাকিতে পারিলেন না—তিনি এখন প্রতাপের ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা ও বিপদের বন্ধু। প্রকৃতির আদেশ ও কর্ত্তব্য কার্য্য উল্লঙ্ঘন করিয়া সংসারে লোক কয় দিন সুখ শান্তি ভোগ করিতে পারে? প্রকৃতির আদেশ ও কর্ত্তব্য অবহেলা জনিত যে অশান্তি রাশি লোক-হৃদয়ে অবস্থান করে, সেই অশান্তিই মনুষ্যকে নিসর্গের আদেশ ও কর্ত্তব্য পালনে শিক্ষা দেয়, তাই শক্তসিংহ আজ অনেক দিন পরেও ভ্রাতৃস্নেহে ও স্বদেশের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রতাপসিংহের অনুকূলে ধাবমান হইলেন।

একটী গভীর ও অপ্রশস্ত গিরিনদীর পুলিনে আসিয়া প্রতাপ উপনীত হইলেন। প্রতাপের ঘোটকরাজ চৈতক এক লম্ফে সেই গভীর সংকীর্ণ তটিনীর পরপারে উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু সৈনিকদ্বয়ের অশ্ব চৈতকের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিতে পারিল না, তথাপি প্রতাপ নিরাপদ হইতে পারিলেন না, কারণ তাঁহার জীবনরক্ষক চৈতকও রণশ্রমে শ্রান্ত, শোণিতাক্ত ও ক্ষতাঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতে আবার স্বীয় প্রভুকে বহন করিয়া এতদূর দ্রুতবেগে আসিয়াছে, সুতরাং তাহার দ্রুতগতি এক্ষণে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। অতএব মোগলসৈনিকদ্বয় নিজ নিজ অশ্বকে দ্রুত চালিত করিয়া প্রতাপের সন্নিহিত হইল। এমত সময় প্রতাপ বন্দুকের ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, চৈতকও যথাসাধ্য চলিতে লাগিল, বন্দুকধ্বনির ক্ষণকাল পরেই প্রতাপ শুনিতে পাইলেন যে দূরে পশ্চাৎ হইতে কে তাহার মাতৃভাষায় গম্ভীর স্বরে বলিতেছে "হো নীলঘোড়ারা আসাওয়ার।" প্রতাপ চমকে চাহিলেন, চাহিয়া কি দেখিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে রোষ, অভিমান ও জিঘাংসা যুগপৎ তাঁহাকে অভিভূত করিল, তিনি পাদদলিত ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন ও অশ্বকে ফিরাইয়া নিজ তরবারি উদ্যত করিয়া শক্তের সন্নিকটে আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শক্ত যখন তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, তখন তাঁহার ভ্রম দূর হইল,

শক্তের ম্লান, বিষণ্ণ ও লজ্জাবনত বদন দর্শনে তিনি বিস্মিত হইলেন—বিস্মিতের অধিক আনন্দিত হইলেন, যে শক্ত তাঁহার রাজ্য রক্ষার্থে দক্ষিণ হস্ত, বিপদে বন্ধু, সম্পদে সুহৃদ্ ও মন্ত্রী, স্নেহে পুত্রতুল্য, সেই শক্ত তাঁহার জীবনের স্বাধীনতা ও মাতৃভূমির ঘোর শত্রু ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়? আর সেই শত্রুকে পুনরায় ভ্রাতারূপে প্রাপ্ত হওয়া যে কি আনন্দের বিষয় তাহা তখন এই শিশোদীয় বীরদ্বয়ই জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, শক্ত সত্বর জ্যেষ্ঠের চরণ বন্দনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন "আপনি দেবতা, আমি নারকী; আপনি স্বদেশবৎসল, আমি কুলাঙ্গার স্বদেশবিদ্বেষ্টা হইয়া পড়িয়াছি; আপনি মাতৃভূমির উপযুক্ত পুত্র, আমি অযোগ্য তনয়; অতএব অধুনা আমি আপনার কৃপার পাত্র, আমাকে দাস ও শিষ্য জ্ঞানে ক্ষমা করুন।" প্রতাপ ভ্রাতার বচন শ্রবণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইলেন, তিনি পদতলে পতিত ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরস্পর অশ্রুসেকে পরস্পরের বক্ষ প্লাবিত করিলেন। প্রতাপ বলিলেন, আজ আমি আমার অনেক দিনের হারারত্ন প্রাপ্ত হইয়া দারুণ দুঃখ ও মনোবেদনা সকল ভুলিয়া গিয়াছি; প্রতাপ ভ্রাতাকে পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার অধিক উপকারী জীবনরক্ষক প্রিয়তম চৈতককে সেই স্থানে হারাইলেন, তাঁহার সেই আনন্দ-সমুদ্রে কে যেন বিষরাশি ঢালিয়া দিল। যে চৈতক ব্যতীত তিনি সেই দিন বিশাল মোগলবাহিনীর মধ্য হইতে বহির্গত হইতে পারিতেন না, সেই চৈতক এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে তুরঙ্গরাজ চৈতক যথাসাধ্য স্বীয় প্রভুর উপকার সাধন করিয়া অশ্বলীলা সম্বরণ করিলে শক্ত নিজ অশ্ব ভ্রাতাকে প্রদান করিয়া বলিলেন, আমি যত শীঘ্র পারি আপনার সহিত মিলিত হইব।" অনন্তর শক্তসিংহ খোরাসানী সৈনিকের অশ্বে আরোহণ করিয়া মোগল শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন, প্রতাপও শক্তের আনকারো নামক অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিতে বাধ্য হইলেন।

শক্তসিংহ মোগল শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া সম্রাটতনয় সেলিমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেলিম শক্তের বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তেজস্বী শক্ত কোন কথাই গোপন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি অকুতোভয়ে খোরাসানী ও মুলতানী সৈনিকদ্বয়ের বধ বৃত্তান্ত ও প্রতাপকে আনুকূল্য প্রদান বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলিলেন একটী বিশাল রাজ্যভার আমার অগ্রজের স্কন্ধে, তাহাতে এখন তিনি নিতান্ত দুরবস্থায় গুপ্ত সৈনিকদ্বয়ের হস্তে জীবনহারা হন দেখিয়া আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? সেলিম শক্তের সত্যপরায়ণতা দর্শনে চমৎকৃত ও প্রীত হইলেন, এবং বলিলেন

"রাজপুত! আমি আপনার সত্যপরায়ণতা দর্শনে অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছি, নতুবা আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন এই কার্য্যকারী ব্যক্তি অবশ্যই দণ্ডার্হ। কিন্তু আমি সন্তোষ সহকারে আপনাকে বিদায় দিতেছি, আপনি স্বেচ্ছানুসারে আপনার ভ্রাতার সহিত মিলিত হউন।" শক্তসিংহ সেলিমের বাক্য শ্রবণে আর তথায় তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া ভ্রাতা বীরপুঙ্গবের নিকট যাত্রা করিলেন। জ্যেষ্ঠকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত ভিনসর দুর্গ পরাজয় করিয়া উদয়পুরে উপস্থিত হইয়া অগ্রজের চরণ বন্দনা করিলেন।

কু, রা।

ভিখারিণীর গীতি।

বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া রমণী-কণ্ঠে ডাকিতেছে—"জয় হরে কৃষ্ণ! ভিক্ষা চাই গো!"

ভিখারিণীকে দেখিয়া গান শুনিবার সাধটা আমার বড়ই জাগিয়া উঠিল, "বলিলাম দিচ্ছি ভিক্ষা, আগে একটা গান গাও না?"

আমার কথা না ফুরাইতেই ভিখারিণী মধুর কণ্ঠে মধুর তানে গান ধরিল—

"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে?"—

আমি মনে করিয়াছিলাম, সে গাহিবে "বল্ হরিবোল বলে পাগল" ইত্যাদি—নয়ত ঐ রকম আর কিছু—ওমা! তা নয়, পোড়ার মুখী এ কি ছাই গান গাহিতেছে?—বেগতিক দেখিয়া বাধা দিয়া বলিলাম, তুমি ও কি ছাই আরম্ভ করিলে? দেবতার গান গাও।"

তা আমার কথা শোনে কে?—দেখি গায়িকা ভাবে বিভোর হইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটাইয়া, গদগদ কণ্ঠে প্রাণের উচ্ছ্বাস ঢালিতেছে—

"এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ
ফুরাইবে,
কিবা জন্মান্তরে মোর সেই সাধ
পুরাইবে?
বিধি! তোরে সাধি শুন,
যদি জন্ম দিবে পুন,
আমারে আবার যেন রমণী-জনম দিবে;
লাজ ভয় তেয়াগিব,
এ সাধ মোর পূরাইব,
সাগর-ছাঁচা রতন নিব, কণ্ঠে রাখ্‌ব নিশি
দিবে"।

গাহিতে তাহার দুই চক্ষে ধারা বহিল! গলাটিও খুব মিষ্ট!—কিন্তু তা হইলে কি হয়? ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে এ রকম গান করিতে শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল—তাহাকে বলিলাম, "তুমি এ রকম গান গাহিলে কেন? ছি!"

ভিখারিণী হাসিল, তার পরে বলিল

"আমি ভিখারিণী, আমার পুঁজি কেবল এই গান।"

আমি। তা, আর কোন ভাল গান শিখিতে পার তো?

ভিখা। আর কোনও গানে আমার প্রয়োজন দেখি না।

আমি। তোমার নিজের জন্যে প্রয়োজন দেখ আর নাই দেখ, দশ জনের জন্যে অবশ্য প্রয়োজন আছে। গৃহস্থ বাড়ীতে ও রকম গান গাইতে নাই।

ভিখারিণী আবার হাসিল, তারপর বলিল "সত্য বলিয়াছ ভাই, আমার নিজের প্রয়োজন সবই প্রায় ফুরাইয়াছে, এখন দশজনের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন। তা তোমাদের গৃহস্থ-বাড়ীতে এ গান গাইব না কেন? তোমাদের গৃহস্থ বাড়ী কি প্রবৃত্তির রাজ্য? সেখানে কি কেবল স্বার্থপরতারই ছড়াছড়ি?

আমি অবাক্! এমন তর কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য মেয়েও আছে?—মুখে বলিলাম "তোমার গানটার মানে বুঝিলে ওসব কথা বলিতে পারিতে না, "প্রবৃত্তি," স্বার্থপরতা" কাহাকে বলে বোঝ কি?"

ভিখা। "প্রবৃত্তি কি স্বার্থপরতার বিষয়ে আমার বেশি জ্ঞান নাই—কিন্তু গানটা কতক দূর বুঝি। বলিলে তুমি বুঝিতে পারিবে কি?"

দেখ দেখি পাঠিকা ভগিনি! হাড় জ্বলিয়া উঠে না? যেন তর্কবাগীশ মহাশয় আমার কাছে বেদ বেদান্ত ব্যাখ্যা করিবেন, তাই আমি বুঝিতে পারিব না? কিন্তু এতক্ষণ সহিয়াছি তো আরও একটু সহিব, তার পর পাঠিকা ভগিনীতে আমাতে মিলিয়া মাগীকে "অর্দ্ধচন্দ্র" দিয়া বিদায় করিব। এই ঠিক্ করিয়া বলিলাম, "বুঝি না বুঝি সে ভার আমার, তুমি বুঝাইতে পারিবে তো?"

ভিখা। তুমি বোঝ না বোঝ, আমি শুনাইব। এই গানেই আমার প্রয়োজন কেন—আমি সংসার-বন্ধন-শূন্যা, পরমুখাপেক্ষিণী, ভিক্ষা-বৃত্তি-ধারিণী, কেন যে এ গীতি-তরঙ্গে প্রাণ ঢালিয়াছি, তা তোমার কাছে বলিব—নরদেবতা কমলাকান্ত ঠাকুর বেণা বনে মুক্তা ছড়াইতে ছড়াইতে যে পথে গিয়াছেন, আমি নরাধমা সেই পদাঙ্কই লক্ষ্য করিয়াছি। আমি প্রথমে গাহিয়াছি—

"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে?"

এজনমে সাধ অনন্ত—পিপাসা অনন্ত; সকল সাধ পোরে না, জনমের সঙ্গেই ফুরাইয়া যায়। যে সকল সাধ পশুবৃত্তি প্রসূত তাহা মানবের সহিত ফুরাইলেই মঙ্গল। কিন্তু যে সাধ, দয়াময় জগদীশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন, যে সাধ পূর্ণ হইলে এই পৃথিবী স্বর্গ-রাজ্য বলিয়া অনুভূত হয়, সে সব পবিত্র সাধ কি কোনও দিন পূর্ণ হইবে না? আমি ভিখারিণী, মনুষ্যকুলে নগণ্যা, দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করাই আমার জীবিকা, আমার প্রাণের প্রাণে

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৫ সংখ্যা। | মাঘ ১২৯৮— ফেব্রুয়ারী ১৮৯২। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-পরিবারের শোকে সহানুভূতি—আমাদিগের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বংশধর প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অকাল মৃত্যুতে পৃথিবীব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্ব স্থানের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজাবর্গ কেবল নয়, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রাজা ও অধিনায়কেরাও তারযোগে সহানুভূতি জানাইতেছেন এবং সাম্রাজ্ঞী কৃতজ্ঞতার সহিত সকলের প্রত্যুত্তর দিতেছেন। এই শোচনীয় ঘটনোপলক্ষে ইংলণ্ডের কোর্ট ৬ সপ্তাহ এবং জনসাধারণ ৩ সপ্তাহকাল শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিবেন। আমাদের রাজ-প্রতিনিধিও আশা করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ মৃত্যু দিন হইতে ৬ সপ্তাহ অর্থাৎ ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শোক চিহ্ন ধারণ করিবেন। এখানকার সিবিল মিলিটারী ও সামুদ্রিক কর্ম্মচারীগণ ২৬এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—গত ২৩এ জানুয়ারি ইহার উপাধি বিতরণ সভার কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। চান্সেলর রাজ-প্রতিনিধি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন, ভাইস চান্সেলর অনরেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যা[illegible]দি বিতরণ করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। অনেক রমণী সভাস্থল ভূষিত করিয়াছিলেন, স্ত্রী এম এ, বি এ ও এম বি স্ত্রীজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

দান—(১) কাশীর পয়ঃ প্রণালীর জন্য পাতিয়ালার মহারাজা ১১,৮০০৲ টাকা দিয়াছেন। (২) আজমীড়ের অনাহারক্লিষ্ট মনুষ্য ও পশুদিগের সাহায্যার্থ হোলকারের মহারাজা ৬৩৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মাঘোৎসব—৬২ সাংবৎসরিক মাঘোৎসব কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন দলস্থ ব্রাহ্মগণ মহা সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের নারীগণ মহিলা সভা, ছাত্রীনিবাস, বালিকা শিক্ষালয়, নীতিবিদ্যালয় প্রভৃতির কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ইহা বড় আশা ও আনন্দের সংবাদ। ব্রাহ্মসমাজের শিরোমণি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে ব্রাহ্মদিগের এক সম্মিলন হইয়াছিল, বৃদ্ধ মহাত্মা উৎসাহের সহিত স্বয়ং তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করেন।

কুমারী এঞ্জিলিনা মারগারেট হোর।

পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো ইহাঁর সহিত পরিচিত ছিলেন, অনেকে বোধ হয় ইহাঁর নামও শ্রুত আছেন। ইনি (S P G) সুসমাচার প্রচার নামক রমণী সমিতির প্রধান সভ্য ও তৎসংক্রান্ত জেনানা মিসনের প্রতিষ্ঠাত্রী। সুন্দরবনের আবাদী প্রদেশ ইহাঁর কার্য্যক্ষেত্র। দেশী সাটী ও উচ্চবুট জুতা পরিয়া তিনি কর্দ্দমময় প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া পল্লীতে পল্লীতে প্রচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। উক্ত প্রদেশের কৃষকরমণী ও তাহাদিগের বালক বালিকাদিগের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি প্রভূত আয়াস ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া অনেক স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবং স্বয়ং গৃহে গৃহে গমন করিয়া বয়স্থাদিগের শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির উপায় বিধান করিতেন। কৃষকপত্নী ও বালক বালিকাগণ তাঁহাকে "ব্রহ্ম মা" বলিয়া ডাকিত এবং একান্ত গোপনীয় কথা সকলও তাঁহার নিকট প্রকাশ করিত। সাংসারিক সুখ দুঃখ, আপদ বিপদ প্রভৃতি সকল অবস্থার কথা তাঁহাকে বিদিত করিয়া তাঁহারা হৃদয়ের ভার লাঘব করিত এবং তিনিও অর্থ, উপদেশ ও সান্ত্বনা দান করিয়া যতদূর সাধ্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার কলিকাতার পিপুলপটীস্থ ভবনের দ্বার সকলেরই জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। এখানে কেবল যে তাঁহার প্রিয় কৃষক-পত্নী ও বালক বালিকাগণের প্রবেশ অধিকার ছিল এমন নহে, সকল শ্রেণীর দরিদ্র অনাথা-

গণ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল, ইহাদিগের দুঃখ মোচনার্থ তিনি স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতেন। কত সময় মিসন কঞ্চ তাঁহার আবশ্যকমত ব্যয় দিতে সম্মত হইত না, তখন তিনি নিজ হইতে কোন না কোন প্রকারে সঙ্কল্পিত সৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জেনানা মিসন প্রতিষ্ঠিত করেন। গত ১৬ বৎসরের মধ্যে ইহাঁর কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তারিত করিয়াছেন যে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই কাল মধ্যে তিনি কৃষকপল্লী সকল শিক্ষিত ও সংস্কৃত করিয়া বাসিন্দাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার প্রগাঢ় যত্নে ও অধ্যবসায়ে কৃষকবালা সকল কেবল যে শিক্ষিত হইয়াছে এমত নহে, নীতিপরায়ণা হইয়া সুশৃঙ্খলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। গত বৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় হইতে অন্যূন ৫০ জন বালিকা গবর্ণমেণ্ট নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষা দিতে কলিকাতার সেনেট ভবনে আসিয়াছিল। এই বিশ্বব্রতধারিণী মহানুভবার একমাত্র প্রযত্নে একটী অজ্ঞানাচ্ছন্ন অসুস্থ জনপদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছিল, কিন্তু এ দেশের গরিবদিগের দুর্ভাগ্যহেতু গত ১০ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে ইনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ইনি ইংরাজ কুলে একটী সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হেনরি হোর, লণ্ডনের ফ্লিট ষ্ট্রীটে ইহাদের একটী (Messrs Hoar's Bank) ব্যাঙ্ক আছে। ইহাঁর মাতা রোমানির দ্বিতীয় আর্ল চার্‌লসের দুহিতা লেডি মেরি। ইনি সুশিক্ষিতা ছিলেন। এমন উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও সাংসারিক অবস্থার সচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়াও এমন একটী তমসাবৃত অসুস্থ প্রদেশ নিজের কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন, যে তাহা ইতিপূর্ব্বে কোন ধর্ম্মপ্রচারক প্রচার কার্য্যের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। তিনি গত বৎসর বর্ষাকালে বিলাতে প্রত্যাগমন করেন এবং স্বীয় কার্য্য-ভার সেণ্ট জন্ বাপ্তিষ্টের ক্রুই ভগ্নী সম্প্রদায়ের হস্তে দিয়া যান। তিনি মনে করিয়াছিলেন আর বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের উচ্চভাব সকল তাঁহাকে আপনার অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র গৃহে অধিক দিন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও তিনি তৎসমুদয়ে কর্ণপাত না করিয়া অবিচলিতচিত্তে শীতের প্রারম্ভেই এখানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। এখানে আসিয়া অবধি যদিও তিনি উক্ত ভগ্নী সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে প্রকাশ্যরূপে নিজ কার্য্যভার প্রতিগ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার

অবসর ছিল না; পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত কার্য্যই স্বয়ং সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন কার্য্য করিতে করিতেই রোগাক্রান্ত হন—ক্রমে সেই রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠে। তাঁহার শরীর অত্যন্ত সুস্থ ছিল, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও জ্বর হয় নাই। সুতরাং এই জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। জ্বরের সহিত ঘোর সন্নিপাত, সুতরাং আর আরোগ্যের সম্ভাবনা রহিল না। ক্রমে অবসন্ন হইয়া উল্লিখিত ১০ই জানুয়ারী মৃত্যু সংঘটিত হয়। তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছিল। এমত ধর্ম্মপরায়ণা মহাব্রতধারিণীর মৃত্যুতে কেবল যে খৃষ্টীয় রমণীসমাজ একটী মহামূল্য রত্ন হারাইলেন এমন নহে, দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। হা মৃত্যু! তোমার কার্য্যের গূঢ়মর্ম্ম কে বুঝিবে?

শোকাশ্রু!

(প্রিন্স বিক্টরের মৃত্যু উপলক্ষে)

কি কঠিন হিয়া তোর—রে নিঠুর কাল!
এমন স্নেহের কলি, বৃন্ত হ'তে ছিঁড়েনিলি,
তোর বিচারেতে বুঝি নাহি কালাকাল?
পুত্রশোকে পাগলিনী হারায়ে নয়নমণি
বিহঙ্গিনী-ছট্‌ফট্ করে যে প্রকার,—
শাবক বিহনে তার,—ঠিক্ সেই দশা মা'র
শূন্যময় দেখিছেন সমস্ত সংসার!
বাজিছে বিষম বাজ সংজ্ঞাহীন যুবরাজ!
হায় কি ঘটিল আজ!--রাজা হবে রাম,--
সে রাম অযোধ্যা ছাড়ি বনে গেল! ঘরবাড়ী
অট্টালিকা—কিছুনয়!—বিধি বামে বাম।
হ'ক না ধরণীশ্বর এড়াতে নারে সে কর,
বিধির অলঙ্ঘ্য বিধি লঙ্ঘিবার নয়!
কে জানিত বিধিশেষে দ্বিতীয়ার চাঁদছেলে
জনকেরে ফাঁকিদিয়ে যাবে এসময়?
সত্তর হয়েছে পার, বৃদ্ধা পিতামহী তাঁর,
ভানু অস্ত নাহি যায় রাজ্যেতে যাঁহার,
তরুণ অরুণ সম নাতি—রূপে-অনুপম
হারায়ে সে ধনে আজ জগৎ আঁধার
দেখিছেন বর্ষীয়সী,—রাজসিংহাসনে বসি
নারিলেন শমনেরে করিতে দমন.
নিয়তির কাছে আর, আছে কিরে প্রতিকার
যমদণ্ড এড়াইতে পারে কোন্ জন?
ওই দেখ রাজবালা, গলায় পরাবে মালা,
আশা করে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়,
কোথায় সে আশা হায়! পরিণত নিরাশায়
অদৃষ্টে রহেছে তাঁর—আজীবন জ্বালা!
সকলি স্বপনবৎ প্রহেলিকা-এজগৎ
নশ্বর—ক্ষণ-ভঙ্গুর মানব শরীর——
রাজ্যৈশ্বর্য্য বীর্য্যবল পদ্মপত্রে যেন জল
টলমল করে সদা নহে ক্ষণ স্থির!
কিবলে প্রবোধি মনে, প্রবোধ মানে কেমনে?
কালে হইবেন যিনি—রাজরাজেশ্বর,—
তিনি আজ তিরোহিত! যেন স্নিগ্ধপরিচিত
কি মিষ্ট চেহারাখানি--অতি মনোহর!
ভ্রমণে ভারতে এসে সুবিশাল দূর দেশে
প্রজার অবস্থা সব নিরখি নয়নে,—
গিয়েছেন সেইদিন, এখনো হয়নি লীন,

দেখিতেছি যেন ছবি হৃদয় দর্পণে;
স্মরিয়ে সে সব কথা মরমে পাইছে ব্যথা
ভারত—কেমনে তাঁরে পাসরিবে হায়!
তাঁহার অভাবে আজ, বাঙ্গলা বম্বে মান্দ্রাজ,
গভীর শোকেতে মগ্ন রয়েছে সবার।
ওই সে বিলাপ ধ্বনি তুলিতেছে প্রতিধ্বনি
পর্ব্বত গহ্বরে পশি—নিবিড় গহনে,
পশু পক্ষী তরুলতা কেহই কহেনা কথা
নীরবে রয়েছে সবে বিষণ্ণ বদনে!
ভারতের নরনারী, উৎসব আনন্দ ছাড়ি,
ধরিয়াছে শোকচিহ্ন জাতি নির্ব্বিশেষে,
ইংরেজেরা কালফিতা, দেশীয়েরা দেশী প্রথা
অনুযায়ী আচরণ করিছেন বেশে।
কোটি প্রাণে মিলি, আজ করসবে এইকাজ,
মায়েরে সান্ত্বনা দেও—শোকের সময়,
শুনিলে প্রজার কথা কিঞ্চিৎ মনের ব্যথা
উপশম হবে তাঁর—কহিনু নিশ্চয়।
বিশ্ব জননীর কোলে গেছেন তোমার ছেলে
পায়ে ঠেলে যত কিছু অনিত্য অসার,
জরা-মৃত্যু নাই যথা, শান্তি-প্রেম-পবিত্রতা,
নিত্য নিকেতনে, সুখ-আনন্দ অপার!
এহেন দেশে যে যায় আর কি সে ফিরে চায়
(এ) পাপ-মরুভূমি পানে, অশান্তি আলয়?
ছাড়িগেলে একবার, দূরে যায় দুঃখভার
কি এক স্বর্গীয় সুখে মগন হৃদয়!
অমৃতধামের যাত্রী, যাইতেছে দিবারাত্রি,
সুযোগ ঘটিলে কেহ থাকিতে না চায়;
কাটি মহা মোহপাশ, চ'লে যায় স্বর্গবাস,
প্রবাসের পদ মান সব ঠেলি পায়।

শ্রীচন্দ্র নাথ দাস।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

একদা মহাভারত-প্রসিদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" ধর্ম্ম রহস্য বুদ্ধিরূপ গুহায় লুক্কায়িত। কথা অসত্য নহে। যাহার যেমন বুদ্ধি সে সেইরূপেই ধর্ম্ম-রহস্য অনুভব করে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রচলিত থাকায় অনেকেরই আজ কাল বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে যখন এই ভারতবর্ষে কেবল মাত্র হিন্দু জাতি বসতি করিত, তখন এ দেশে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইবার সেরূপ কারণ না থাকায় ধর্ম্ম প্রায় একরূপেই অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু আজ কাল এ দেশে নানা দেশীয় লোকের সমাগমে নানা প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছে, তাহাতেই এ দেশ আজ কাল ধর্ম্মবিপ্লব-স্রোতে ভাসমান। ধর্ম্মের স্থিরতা নাই, অনুষ্ঠানের নিয়ম নাই, প্রত্যেক মনুষ্যই আপন আপন ইচ্ছার ও বুদ্ধির অব-লম্বনে উচ্ছৃঙ্খল। অনেকেই বলেন ও মনে করেন, সংসারে পরমেশ্বরের প্রণীত কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। দেশভেদে ও জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ দেখা যায়, সে সমস্তই মনুষ্যকল্পিত। মানব-

জাতি যাবৎ না সভ্যতার আলোক দেখিতে পায়, তাবৎ তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে নানা প্রকার কুসংস্কারাপন্ন হইয়া বিবিধ বৃথা আচারে রত হয়। তাহারা জগৎ যন্ত্রের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করতঃ তত্ত্বাবত্তের কারণ অনুসন্ধানে অক্ষম হইয়া সে সমুদায়কে ঈশ্বরকৃত মনে করে এবং যাহার যে প্রবৃত্তি বলবতী থাকে, সে সেই প্রবৃত্তির তৃপ্তিকর অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া অবধারণ করে। সেইজন্যই হিন্দুদিগের তন্ত্র শাস্ত্রে মদ্য মাংস ও স্ত্রীসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বা আশ্রয়স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কাহারও মতে পশু হিংসাদি নিষ্ঠুর কার্য্যও ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। আবার অন্যের মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। এইরূপে প্রবৃত্তি অনুসারে বিবিধ অজ্ঞ মনুষ্য ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ কল্পনা করিয়া লয়; পরন্তু তাহারা জানে না যে, এই বিশ্বই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের প্রথম রচিত মূল ধর্ম্মশাস্ত্র। জ্ঞানিগণ সেই পরমারাধ্য বিশ্বনাথের রচিত এই বিশ্ব শাস্ত্রের অন্তস্তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করতঃ কোন্ বস্তুর কিরূপ স্বভাব, কোন্ বস্তুর সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ, এই সকল রহস্য জ্ঞাত হইয়া করুণাময় পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নিয়ম প্রতিপালনরূপ পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকেন এবং অবশেষে কৃতার্থ হন। যাঁহারা পরমেশ্বরের অনুমোদিত কার্য্য কলাপের প্রকৃত তথ্য বুঝিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিরসে আর্দ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হন এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই বিশ্বপতি পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি স্তুতি ও প্রণামাদি করিতে অলস্যপরবশ হন না। পরমেশ্বর যে সকল বস্তু সৃজন করিয়াছেন, সে সমস্তই জীবের হিতের নিমিত্ত। অপিচ তিনি যে জীবকে যেরূপ স্বভাবান্বিত করিয়াছেন, তাহার সহিত বাহ্যবস্তুর তদনুরূপ সম্বন্ধও স্থির করিয়া দিয়াছেন। ব্যাঘ্রজীবকে অতি ক্রূর স্বভাবান্বিত করিয়াছেন, সেই নিমিত্তই তাহাদের সেই হিংসা স্বভাবের তৃপ্তিসাধক বহু পশু সমাকীর্ণ অরণ্য ভূমিকেই তাহাদের বাসোপযোগী করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ছাগ মেষাদি জীব মৃদুস্বভাব ও ভীতিপরায়ণ, সেই নিমিত্তই লোকালয়ে তাহাদিগের বাস অবধারণ করিয়া দিয়াছেন। অধিক কি বলিব, যে জীবের যাদৃশ স্বভাব, বাহ্য বস্তুর সহিত তাহাদের তদনুরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

মনুষ্য জীব এক প্রকার স্বভাবান্বিত নহে। জগদীশ্বর ইহাদিগকে বহু বিরুদ্ধ স্বভাবান্বিত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। মনুষ্য এক সময়ে ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া নৃশংস স্বভাব ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা ভীষণ হয়, অন্য সময়ে আবার কারুণ্যরসে আপ্লুত হইয়া পিতা মাতা অপেক্ষাও হিতকর ও প্রিয়দর্শন হয়। বিশ্বনিয়ন্তা যেমন এই মনুষ্য

জীবকে বিরুদ্ধ বহু গুণের আধার করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তেমনি ইহাদিগকে সেই সকল গুণের সামঞ্জস্ত করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন। যে সকল জ্ঞানী এই তথ্য জ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই আমাদের মতে ধার্ম্মিক। কেন না তাদৃশ জ্ঞানশালী মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নিয়ম পালন করতঃ সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; অজ্ঞানের স্তায় ভ্রমজালে জড়িত হইয়া আপনাকে ও অন্তকে বৃথা দুঃখ-ভাজন করেন না। অতএব, পরমেশ্বর-প্রণীত প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিতে পারিলেই যখন মানবজাতির ধর্ম্মানুষ্ঠান করা সিদ্ধ হয়, তখন আর তাহাদের জন্য তাঁহার অন্য প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না এবং তাহা সম্ভবও নহে। তিনি মানবদিগকে আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে বাচনিক নিষেধ করেন নাই। কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠানে যে দুঃখোদয় হয়, সেই কারণ কার্য্যসম্বন্ধ স্থির করিয়া দেওয়াতেই সে-সকলের নিষেধ সাধিত হইয়াছে। তিনি যেমন স্বপ্রণীত প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিবার নিমিত্ত কার্য্যবিশেষে দুঃখ সংযোগের বিধান করিয়াছেন, তেমনি নিজাজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কার্য্য বিশেষে সুখসংযোগের বিধান করিয়াছেন। শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে যদ্রূপ শারীরিক দুঃখ আগত হয়, তদ্রূপ মানসিক নিয়ম প্রতি-পালন না করিলেও মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হয়। এই সকল ব্যাপার ও অদ্ভুত রচনা কৌশল দেখিয়া শুনিয়া স্থির করা যায় যে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ প্রকৃতি-শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্ময় শাস্ত্র আমাদের নিমিত্ত প্রস্তুত করেন নাই। জগৎ বিধাতা পরমেশ্বর যদি মনুষ্য জীবের হিতার্থে কোন বাচনিক শাস্ত্র প্রস্তুত করিতেন বা প্রকাশ করি-তেন, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বদেশে একই প্রকার হইত এবং সকলকেই তাহার অনুবর্ত্তী হইতে হইত। তাহা হইলে আর কোনও ব্যক্তির সহিত কাহারও আচার ব্যবহার ও ভক্ষ্যপেয়ের অনৈক্য থাকিত না। প্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদযুক্ত মতবাদ থাকা-তেই স্থির হয় যে, সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রই মনুষ্য-কল্পিত, একটীও ঈশ্বরের আদেশ নহে। এইরূপ বিচার এক সম্প্রদায়ের মনো-মধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক, আবার অন্য সম্প্রদায়ের মনে অন্যবিধ ধারণাও লক্ষিত হয়। পশ্চাৎ এবিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। *

* এই বিষয় আলোচনা করিতে অনেক সময় আবশ্যক হইবেক ইহাতে পাঠক পাঠিকা-গণের বিরক্তি না হয়।

স্বর্গীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ।

আবার কি শুনি—নিদারুণ বাণী!
সত্যই কি সেই—অস্তাস্ত মণি
হয়েছে শমন? অদৃষ্টে কেমন
ফাঁকি দিয়ে যায়—সুপুত্র যেজন!
সেদিন গিয়েছে—রাজেন্দ্র—ঈশ্বর,
দিবানিশি শোকে দহিছে অন্তর!
আছিল অযোধ্যা—অঞ্চলের নিধি,
সেধনে বঞ্চিত করিলেন বিধি!
শিক্ষিত সমাজ—সবে মিলি আজ,—
করি অনুনয়,—কর এই কাজঃ—
অযোধ্যার তরে ফেল অশ্রুবারি,
যুবক প্রাচীন—কিবা নরনারী।
হিমালয় হতে কুমারিকা পার,
ক্রন্দনের রোল উঠুক আবার!
দেখুক জগৎ—অযোধ্যার তরে
সমস্ত ভারত ব্যথিত অন্তরে—
বিলাপ করিছে! রামাভাবে যথা—
অযোধ্যার দশা—ঘটেছিল হায়!
পঞ্জাব মান্দ্রাজ বম্বে—বাঙ্গালায়
আসুক সে দৃশ্য—দেখুক সকলে,
জাতীয় সমিতি—একতা শিকলে
বাঁধিয়াছে সব! ভাব অভিনব
দিয়েছে ভারতে,—জাতীয় উৎসব—
বসেছে সেথায়—এই সাত বার।
যতনে উৎসাহে হিউম্ অযোধ্যার!
সে অযোধ্যানাথ—জীবিত নাই!
সমিতির প্রাণ—জানেন সবাই।
নাগপুর হ'তে—ফিরিয়ে যখন
যাইতেছিলেন আপন ভবন।
সামান্য সরদি হ'তে 'নিমোনিয়া'—
(কি বিষম ব্যাধি!) গেছে তাঁরে নিয়া।
কংগ্রেস হবে না—শুনি সেই কথা—
হ'ল দৃঢ় পণ!—(কে করে অন্যথা?)
ব্যয়ভার সব—বহিব শিরে—
একাকী,—দিব না যেতে সমিতিরে!
এলাহাবাদেতে,—হ'ল স্থিরতর—
বসিবে সমিতি আগামী বছর।
উৎসাহে উদ্যমে—অসীম অতুল!
অতি উচ্চপদ—সম্পদ বিপুল;
দেশহিতে তাঁর সদা প্রাণপণ
কিসে দৃঢ় হবে—জাতীয় বন্ধন,
সেই চিন্তা-সার—শয়নে-স্বপনে;
এই যে সমিতি তাঁহারি যতনে!
যাও স্বর্গধামে—লভগে বিরাম,—
বিষয় বাসনা—ভোগলিপ্সাকাম
দেও বিসর্জ্জন—বিস্মৃতি সাগরে;
কত সুখরত্ন—জননীর ঘরে
ভুঞ্জিবে সেথায়,—তার তুলনায়
সংসার-সম্পদ—তৃণাদপি প্রায়!
ওই দেখ মায় কুসুমের হার
গলে পরাইয়ে দিছেন তোমার!
বসাইয়ে দিব্য রত্ন-সিংহাসনে,
তুষিছেন কিবা মধুর বচনে!
আশীষ করি হে তুলি দুই কর,
ভুঞ্জ শান্তি সুখ সেথা নিরন্তর।

শ্রীচ

কে সতীদাহ নিবারণ করেন ?

সহমরণ-নিবারণে রাজা রামমোহন রায় ও পাদরিরা কত দূর কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এখনও অনেকের কুসংস্কার রহিয়াছে। অনেকের বিবেচনায় খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকেরাই গবর্ণমেণ্টকে উক্ত বিষয়ে উৎসাহী ও উদ্যোগী করিয়া তোলেন। হিন্দুদিগের অধিকাংশের বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের ও কতিপয় পাদরিরও ধারণা ছিল ও আছে, যে রাজা রামমোহন রায় উল্লিখিত ব্যাপার রহিত করিবার জন্য একমাত্র উদযোগকর্ত্তা না হউন, প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী। এরূপ বিরুদ্ধবাদী মতের সত্যাসত্য আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মধুময় সুফলের প্রত্যাশা করা না যাউক, সত্য নির্দ্ধারণের পক্ষে সহায়তা হইতে পারে, বলা বাহুল্য মাত্র।

সর্ব্বাগ্রে সহমরণ ও অনুমরণ এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। স্বামীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ হওয়াকে সহমরণ বলে। আর স্বামী, বিদেশে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া পতিগত-প্রাণা অঙ্গনা, চিতা প্রস্তুত করিয়া বা করাইয়া উপরত ভর্ত্তার উদ্দেশে অনলে জীবনাহুতি সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, স্বামি-ভক্ত নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধন করিলেন, ইহাকে অনুমরণ কহা গিয়া থাকে। কোন্ সুপ্রাচীন কাল হইতে এদেশে সহমরণ ও অনুমরণ চলিয়া আসিতেছিল, তাহার নির্ণয় অসাধ্য না হউক, দুঃসাধ্য বটে। হিন্দু শাস্ত্রে অরুন্ধতী, আদর্শ সতী। ত্রেতাযুগে অরুন্ধতী দেবী ভারতাকাশ মণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকিয়া সকলের মন প্রফুল্ল করিয়াছিলেন। হিন্দুরাজ হইতে প্রাচীন কালে হিন্দুগণকর্ত্তৃক সতীদাহ রহিত করিবার নিমিত্ত কখনও কোনও চেষ্টা হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। মোগল বা পাঠানদের দ্বারা কি কোন চেষ্টা হইয়াছিল ? এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি, মুসলমান রাজত্বকালে মোগলকুল-শিরোভূষণ আকবর কর্ত্তৃক উহার তিরোধানার্থে একবার উদ্যোগ হইয়াছিল, এতাদৃশ প্রবাদ শুনা গিয়াথাকে। পাঠান-শাসনকালে কিন্তু কিছুই ঘটে নাই—কর্ত্তৃবর্গের উদ্যোগে কিছুমাত্রও কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই, আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

লর্ড ওয়েলেস্লির রাজত্ব সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি ঐ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা হয়। উক্ত শাসনকর্ত্তা, নিজামত আদালতকে আদেশ দেন যে, ঐ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতামত কি, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। অতএব বলিতে হইবে, সতীদাহের ইতিবৃত্তে ঐ বৎসর, ঐ মাস ও ঐ তারিখ, চিরস্মরণীয়। আর সেই সঙ্গে উল্লিখিত রাজ-

প্রতিনিধির নামও ভারতবাসীদের হৃদয়-পটে অঙ্কিত থাকা কর্ত্তব্য।

ঐ বর্ষে ৫ই জুনে নিজামত আদালত ঐ শাসনকর্ত্তার অনুজ্ঞায় সহমরণ সম্বন্ধে এক নিয়ম পত্র প্রস্তুত করিয়া প্রধান রাজপুরুষগণের নিকট পাঠান। তদ্বিষয়ে বিবেচনার্থে নিজামত আদালত উল্লিখিত রাজপ্রতিনিধির সাহায্য করিতে প্রাণপণে যত্ন করেন। যে সকল অবস্থায় সতীদাহ প্রচলিত থাকিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ও যে যে অবস্থায় তাহা নিষিদ্ধ থাকিতে পারে, উক্ত বিচারালয় তৎসম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত দিয়াছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্টে বুন্দেলখণ্ডের মাজিষ্ট্রেট নিজামত আদালতকে এক পত্র লিখেন।

ঐ বৎসর ৩রা সেপ্টেম্বরে নিজামত, গবর্ণর জেনেরলকে ঐ বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞাপন করেন। ৫ই ডিসেম্বরে গবর্ণর মহোদয় নিজামত আদালতকে আইনের একটা পাণ্ডুলেখ্যের নিমিত্ত, অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই এপ্রিল এক রেগুলেশন্ অর্থাৎ রাজ-নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল।

অতঃপর যে সময়ের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহা মার্কুইস অব্ হেষ্টিংসের রাজত্ব কালের কথা। তাঁহার নামান্তর লর্ড ময়রা। তাঁহার এই শেষোক্ত নাম আমাদের অধিকতর পরিচিত। তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ অবধি এদেশের গবর্ণর জেনেরেল ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই সহমরণ সংক্রান্ত এক নিয়ম প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ নিয়ম, হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় নাই। তখন বৃটিষরাজ সভয়ে অথচ ক্রমশ হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন। তখনও প্রজাদের অসন্তোষের কারণ প্রকাশ পায় নাই; যে মহতী ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী হিন্দুকুলাঙ্গনাগণের পরলোকগত পতির সহমরণ ও অনুগমন-নিবারণে সমুৎসুক হইয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুর এই সময় উদ্ভিন্ন হইল। এই অঙ্কুর উদ্গমের পূর্ব্বে রাজপুরুষগণ নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সারকুলার আদেশে সহমৃতার সংখ্যা নিরূপণার্থে এক তালিকা প্রস্তুত হয়। এতদ্বারা রাজপুরুষগণের বহুদিনের নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত হইল। তাঁহারা যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নিদ্রাভঙ্গে প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। পরিশেষে মনে মনে অসীম সাহসে ভর দিয়া অথচ বাহ্য ভঙ্গীতে মনের ভাব গোপন করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তখনকার তাঁহাদের মানসিক ভাবরাজ্যের তথ্য অনুসন্ধান করিতে পারে, দূরদর্শী এমন কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। সর্ব্বসমেত ৬ ছয়টি বিভাগে যত সতী সহমৃত হইয়াছিলেন তাহার তালিকা এইরূপ ঃ—

(ক) কলিকাতা বিভাগে ২৫৩ নারী
(খ) ঢাকা বিভাগে ৩১ „
(গ) মুরশিদাবাদ বিভাগে ১১ „
(ঘ) বারাণসী বিভাগে ৪৮ „
(ঙ) পাটনা বিভাগে ২০ „
(চ) বেরেলী বিভাগে ১৫ „

ভূয়োদর্শী সহৃদয় গবর্ণর জেনারেল, স্বাধিকার-সময়ে ব্যবস্থাপক সমাজের প্রতিনিধি সভাপতির ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বরের আদেশানুসারে নিজা-মত আদালত, মাজিষ্ট্রেটের ও পুলিশের পর্য্যবেক্ষণার্থে যে সাধারণ নিয়ম প্রচার করিয়া দেন, তাহাতে তিনি ভারত-বর্ষীয়দের কৃতজ্ঞতার পাত্র সুতরাং প্রীতির আধার হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ কি? ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না হইলেই প্রজারা আপনাদিগকে সুখী জ্ঞান করে।

যাঁহাদের ধারণা রহিয়াছে, বল-পূর্ব্বক সকল সতীকে দাহ করা হইত, তাঁহাদের মহান্ ভ্রম। আমরা এরূপ বলি না, কোন স্থলেই বলপ্রয়োগ হইত না। উভয়ই ছিল। স্থলবিশেষে বল-প্রয়োগে সতীদাহ, কোথায় বা স্বেচ্ছায় স্বর্গলাভের নিমিত্ত সতীদাহ ঘটিত। ইহার প্রমাণ আবশ্যক মতে দিতে পারিব।

এত ক্ষণের পর আমরা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে উপনীত হই-লাম। তাঁহার কার্য্য-সম্বন্ধে ত্রিবিধ মত প্রচলিত আছে। যথা—

(ক) রামমোহন রায়, অনেকের মতে সতীদাহের প্রথম উদ্যোগী।

(খ) কতক গুলির বিবেচনায় তিনিই একমাত্র উদ্যোগকর্ত্তা।

(গ) অবশিষ্ট এক দল বলেন, তিনি প্রথম উদ্যোগী বা একমাত্র উদ্যোগী নহেন বটে, কিন্তু একজন প্রধান উদ্যোগী।

এখন ঐ তিনটি বিষয় বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

(ক) রাজা রামমোহন যে সহমরণ রহিত-ত্যের প্রথম উদ্যমে কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই, তাহা আমাদের এই প্রব-ন্ধের সূচনাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং স্বতন্ত্র প্রমাণ অপ্রয়োজনীয়।

(খ) তিনি একমাত্র উদ্যোগকর্ত্তাও হইতে পারেন না। কেন না, তাঁহার চেষ্টার বহু পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টের আয়োজন চলিতেছিল।

(গ) তবে তিনি যে এক প্রধান উদ্যোগকারী, তাহাতে কিছু মাত্রও দ্বিধা হইতে পারে না। যে কারণে এই গুরুতর ব্যাপার, তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা এই,—১২১৮ সালে ২৭ চৈত্রে রবিবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে (১৮১০ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিলে) তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহন রায়ের মৃত্যু হইলে, তদীয় মধ্যমা প্রিয়তমা অলকমঞ্জরী (বা অলকমণি) স্বামীর অনুগমন করেন। এই প্রবন্ধে জগন্মোহন বাবুর মধ্যমা প্রিয়তমা ঐ দুই নামের অন্যতরে উল্লিখিত হইবেন। জগন্মোহন

রায়ের সর্ব্বশুদ্ধ চারি পত্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নাম যশোদা। দ্বিতীয়ার নাম অলকমঞ্জরী বা অলকমণি। তৃতীয়ার নাম অজ্ঞাত। চতুর্থীর নাম দুর্গামণি। অলকমণি কনিষ্ঠা সপত্নী ভিন্ন আর দুই জনকে (প্রথমা ও তৃতীয়াকে) স্বামীর সহগামিনী হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই,—সতীদের সংস্কার ছিল, যিনি ভর্ত্তৃসঙ্গিনী হইবেন, পর জন্মে তিনিই কেবল ঐ পতির প্রেয়সী হইবেন। অনেক সতী সেই কারণে অপর সপত্নীগণকে সঙ্গিনী করিতে চাহিতেন না। আমাদের সতী অলকমঞ্জরী কিন্তু সেরূপ স্বার্থপরতায় পূর্ণা ছিলেন না। ঐ আহ্বানেই তাঁহার উদারতার পরিচয় দিতেছে। সে যাহা হউক, প্রথমা ও তৃতীয়া, তাঁহার সঙ্গিনী হন নাই। প্রথমা বলিয়াছিলেন, "আমি কেন পুড়ে মরব্? অপঘাতে কেন মরতে যাব? বেঁচে থেকে স্বামীর জন্যে ব্রহ্মচর্য্য করব।" তৃতীয়ার কোন উত্তর, আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। কনিষ্ঠা সপত্নী কেন সহমরণে অনুরুদ্ধা হন নাই, এই প্রশ্ন হইতে পারে। তাঁহার অষ্টম বৎসরের এক পুত্র ছিল। তিনি মরিলে পুত্রের দশা কি হইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহাকে অলকমঞ্জরী আহ্বান করেন নাই। পুত্রের নাম গোবিন্দপ্রসাদ রায়। যাঁহার সঙ্গে রামমোহনের পরে মোকদ্দমা চলিয়াছিল, তিনিই রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র। গোবিন্দপ্রসাদের জননী সহগামিনী হইলে, পাছে গোবিন্দপ্রসাদ, অযত্নে মরিয়া যান, এই কারণে তাঁহার সহমরণ প্রার্থনীয় নয়, এই বিবেচনায় তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। তখন রাজা স্বীয় জন্মভূমি-প্রদেশে (খানাকুল কৃষ্ণনগরে) উপস্থিত ছিলেন না। তখনও তিনি কলিকাতাকে কার্য্যক্ষেত্র করিতে পারেন নাই। এই সময়ের প্রায় চারি বৎসর পরে যখন তিনি কলিকাতায় বসতি গ্রহণ করেন, তখনই আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সতীদাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইত। সতীদাহের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া আমরা এত বাক্যব্যয় কি নিমিত্ত করিতেছি, অনেকেই হয়তো এই কথা ভাবিবেন। তাহার কারণ এই,—কোন সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী লেখক বলিয়াছেন, রামমোহন রায়, ঐ সময়ে গৃহে উপস্থিত ছিলেন, এবং উক্ত সময়ে বলপ্রয়োগ করিয়া অলকমঞ্জরীকে দগ্ধ করা হইয়াছিল। এই বর্ণনা ঠিক্ হয় নাই। রামমোহন রায় উপস্থিত থাকিলে, ঐ কাণ্ড কদাচ সংঘটিত হইতে পারিত না। প্রকৃত ঘটনা এই,—রামমোহন রায় মহোদয় তখন রঙ্গপুরে থাকিতেন। ঐ শোচনীয় ঘটনার পর লাঙ্গুড়পাড়ার বাটীতে আসিয়া তিনি নিজ জননীর সঙ্গে অনেক বাদানুবাদ করেন। পুত্র ভাবিয়াছিলেন, জননী উদ্যোগিনী হইয়া ঐ ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি মাতার সহিত ঘোর-

তর বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ওরূপ বলিবার যুক্তি প্রবলতর ছিল। ঐ বধূ, জীবদ্দশায় সুখিনী ছিলেন, এরূপ বলিতে পারা যায় না। সপত্নী থাকিলে, যে প্রকার মনঃকষ্ট ঘটিবার কথা, তাঁহাকে সেরূপ ক্লেশ অশেষ মতে ভোগ করিতে হইত, ইহা রাজা রামমোহনের অগোচর ছিল না। কিন্তু রামমোহন-জননীর তাহাতে কিছুমাত্রও দোষ দেখিতে পাই না। তিনি ঐ কার্য্যে কেবল উদাসীনা ছিলেন, এমন নয়; কিন্তু উহা তাঁহার অজ্ঞাতে ঘটিয়াছিল। প্রকৃত কথা এই,—জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহনের মৃত্যুতে তিনি উন্মাদিনীর মত বিবশা হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিয়া একটা গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয়া পুত্র-বধূর সহগমনে তাঁহার সম্মতি কোথায়? সম্মতি থাকা দূরে থাকুক, তিনি ঐ ঘটনার বিন্দু বিসর্গ সেই দিন জানিতে পারেন নাই। রায়-গোষ্ঠীতে এই সতীদাহই একমাত্র ঘটনা। ইহার পূর্ব্বে বা পরে ঐ রূপ আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। রামমোহন রায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ জেঠতুতো ভাই নবকিশোর রায় মহাশয়, ঐ ঘটনা বিলক্ষণ জানিতেন। কেবল জানা নয়, সকলই তাঁহাকে নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে তিনি ঐ পরিবারের কার্য্যকর্ত্তা ছিলেন। তিনি পরম হিন্দু হইয়াও, উক্ত ভ্রাতৃজায়াকে ঐ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে তিনি কাকুতি মিনতি করিয়া সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কামিনীকে বলিয়াছিলেন, "আপনি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া। আপনি আমাদের মাতৃতুল্যা। আপনি দেহত্যাগ করিলে, আমরা মাতৃহীন হইব।" ইত্যাদি কত কথাই বলিয়াছিলেন। ঐ সকল অনুনয়ের প্রত্যুত্তরে অলকমণি বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুর-পো! আমাকে নিষেধ করিও না। আমি আর এ সংসারে থাকিতে পারিব না। আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।" যথার্থ সতীর এই উক্তিই বটে। কেন না, অলকমণি, সাক্ষাৎ সাধ্বী অরুন্ধতী-তুল্যা বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। তিনি তখন পঞ্চাশ বৎসরের কিছু ন্যূন-বয়স্কা ছিলেন। ২১ চৈত্র অপরাহ্ণে ঐ কার্য্য সমাধা হয়। নবকিশোর রায়, রায়-গোষ্ঠীর প্রতি গৃহে ঐ সংবাদ দিয়া আসিলেন। বসতি বাটীর অনতিদূরে রঘুনাথপুরে ঐ চিতা সুসজ্জিত হইয়াছিল। সেই স্থানে এখনও অশ্বত্থ বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। এই সতীদাহে কোন রূপ বল প্রয়োগ করা হয় নাই। এই সময় হইতে সতীদাহ রহিত করিবার জন্য রাজার অন্তরে ব্যাকুলতা জন্মিল, তিনি ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এক খানি দরখাস্ত, গবর্ণর জেনারেলের নিকট

অর্পিত হয়। তাহার বিরুদ্ধে আর এক খানি আবেদন, গবর্ণরের গোচরে প্রেরিত হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আসিয়াটিক জর্ণালে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল। কোন কোন লোকের মতে এই আবেদনের মূলে রামমোহন রায় ছিলেন। ইহার অকাট্য প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ঐ কার্য্যে রামমোহনের লিপ্ত থাকা অসম্ভব নয়।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে (১২২৫) সালে রামমোহন রায়, সহমরণের বিরুদ্ধে "সহমরণ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব" নামে প্রথম পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রচারিত করেন। ঐ বর্ষেই ইংরাজিতে ঐ গ্রন্থ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। হিন্দু মহোদয়গণের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হইতে লাগিল। রামমোহনও নিষ্কর্ম্মা বা অলস হইয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ঐ প্রতিবাদের প্রতিবাদ বাহির করিলেন। ১২২৬ সালে ১৬ই অগ্রহায়ণে (১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৩০ নবেম্বর) উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাই তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক।

এতদ্বিষয়ে তিনি যত গুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেগুলির নাম ও প্রকাশের সময় নিম্নে লিখিত হইতেছে। তাহা দেখিলে বোধগম্য হইতে পারিবে ও সুবিচারের সুবিধা হইবে।

পুস্তকের নাম।	সাল।	খৃষ্টাব্দ।
(১) সহমরণ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব	১২২৫,	১৮১৮।
(2) Translation of a conference, between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widow alive, from the original Bengali.	"	1818
(৩) সহমরণ বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব	১২২৬	১৮১৯।
(4) A Second conference between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widow alive.	1227	1820.
(৫) সহমরণ বিষয়ক তৃতীয় প্রস্তাব	১২৩৭	১৮৩০।
(6) Anti-suttee Petition to the House of commons.	"	1830.
(7) Abstract of the Arguments regarding the burning of widows considered as a religious rite.	"	"

(ক্রমশঃ)

পৃথিবী কীদৃশী ?

তাদৃশী তাহার কাছে, যাদৃশ যে জন ;
স্ব স্ব মুখ-প্রতিবিম্ব মুকুরে যেমন।
চিত্রজীবী কাছে, উহা চারু চিত্রপট ;
বিচিত্র বিজ্ঞান-গ্রন্থ, পণ্ডিত নিকট।
সৈনিক সমীপে পৃথ্বী সমর-প্রাঙ্গণ ;
বিলাসী ধনীর ঠাঁই,—প্রমোদকানন।
ভীষণ শ্মশান-ক্ষেত্র, শোকার্ত্তের পাশে ;
নিদ্রা-হেতু সুখশয্যা, অলস সকাশে।
বণিকের সন্নিধানে, বিচিত্র বিপণি ;
বৃদ্ধের নিকটে, যেন মৃত্যুর সরণি।
শিশু-পাশে, ক্রীড়া-স্থলী হেন নাহি আর,
পরান্নভোজীর পক্ষে, ভীম কারাগার।
নর-নারী এ' সংসারে নাট্যশালা মাঝে,
করে নিত্য অভিনয় সাজি নিজ সাজে।

নীতিকথা ও দৃষ্টান্তমালা।

১। সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ হয় এরূপ নহে, উর্ব্বর ক্ষেত্রে যে কণ্টক বৃক্ষ জন্মে, তাহার কি বেধন শক্তি থাকে না ? চন্দন কাষ্ঠের সুঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার কি দাহিকা শক্তি থাকে না ?

২। মহতের দুর্বাক্য বরং সহ্য হয়, কিন্তু মহতের বলে বলীয়ান ক্ষুদ্রের দুর্বাক্য সহ্য হয় না। প্রচণ্ড সূর্য্য তাপ সহ্য হইয়া থাকে, কিন্তু সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত বালুকাকণার উত্তাপ সহ্য হয় না।

৩। উত্তম, মধ্যম ও অধম লোকের মিত্রতা এবং অধম, মধ্যম ও উত্তম লোকের শত্রুতা, প্রস্তর, বালুকা ও জল নিহিত রেখার ন্যায়।

৪। হাস্যও সময় সময় মহা অনিষ্টের সূচনা করে। প্রিয়দর্শন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইলে ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি হইয়া থাকে।

৫। নিরন্তর শাস্ত্রপাঠ করিলেই যে জ্ঞানী হয় এরূপ নহে। ঔষধ সুসেবিত না হইয়া কেবল নামোচ্চারিত হইলেই রোগের উপশম হইতে পারে না।

৬। মূর্খ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে শান্ত না হইয়া প্রকুপিত হয়। সর্পকে দুগ্ধ পান করাইলে তাহার বিষ হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৭। কোমলমতি বালকগণের মনে যে বিশ্বাস একবার বদ্ধমূল হইয়া যায়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা আর উৎপাটিত হইবার নহে। কুম্ভকার লিখিত মৃণ্ময়-পাত্রে রেখা পড়িলে তাহা আর সহজে যায় না।

৮। সময় বিশেষে আত্মীয়ব্যক্তিও শত্রু এবং অনাত্মীয়ব্যক্তিও মিত্র হয়। দেহজ ব্যাধি জীবননাশ করে, কিন্তু আরণ্য ঔষধ জীবন দান করিয়া থাকে।

৯। সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর

সুখ সংসারে অব্যর্থ নিয়ম। চক্রনেমির গতি পরিবর্ত্তন ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

১০। ক্ষুদ্র ব্যক্তিও মহতের সহায়তা পাইলে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। স্বল্পসলিল পদ্বল মহানদীর সহিত মিলিত হইয়া মহাসাগরে পতিত হয়।

১১। দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণগ্রহণ করা ও গুণ পরিত্যাগ করিয়া দোষগ্রহণ করা সাধু ও অসাধুর প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। শিশুর স্তন্যপান ও জলৌকার রক্তপান ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

১২। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্যই মহতের গুণ শ্রবণ করিয়া থাকে। ব্যাধ কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত না করিয়া সপ্তনলী সন্ধান করিবার জন্যই কোকিলের মধুর কাকলী শ্রবণ করিয়া থাকে।

পক্ষী কি আনন্দে গান গায়!

পক্ষী কি আনন্দে গান গায়! আমরা বলি গায়। ভাল, যদি গাইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য জিজ্ঞাস্য পক্ষীর আবার আনন্দ কি প্রকার? বিধাতা সকল প্রাণীকে প্রাত্যহিক জীবনের কিয়দংশ আনন্দে, কিয়দংশ নিরানন্দে, কিয়দংশ উৎসাহে কিয়দংশ নিরুৎসাহে অতিবাহিত করিতে দিয়াছেন, না দিলে সংসার চলিত না। পক্ষিজাতি এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে। ইহার আনন্দ বা নিরানন্দ বেশ উপলব্ধি হইতে পারে। মনে কর কোন নিষ্ঠুর লোক নীড় হইতে শাবক অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। পক্ষীটী তাহাকে খাওয়াইয়া কিম্বা তাহার নিকট বসিয়া যে ভাবে ছিল, তখন কখনও সে ভাবে থাকিতে পারে না; তখন তাহাকে দেখিলেই বা তাহার ডাক শুনিলেই অনায়াসে অনুমিত হয় যে সে শোকবিহ্বলা হইয়াছে কিম্বা আর্ত্তনাদ করিতেছে। পূর্ব্বের চীৎকারের সহিত এখনকার চীৎকার তুলনা করিলে পার্থক্য বিশেষরূপ বোধগম্য হয়। পূর্ব্বের অবস্থা বা ডাক ছিল সুখের ও আনন্দের, এখনকার অবস্থা বা ডাক শোকের ও নিরানন্দের। মানবের হৃদয় আহ্লাদে ও আমোদে উদ্বেলিত হইলেই মানব গান গায়, না গাইয়া থাকিতে পারে না; কারণ, এমন মানব জগতে অদ্যাবধি জন্মগ্রহণ করে নাই, যে কখনও গান গায় নাই, কিম্বা যাহাকে কখনও সঙ্গীতে মুগ্ধ করে নাই। মানুষেরা যদ্যপি এইরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইতর পশু পক্ষী

সাধ জাগিতেছে, একদিন দেখিব মা জন্মভূমির মলিন মুখে হাসি ফুটিয়াছে, একদিন দেখিব মা'র বক্ষ পুত্ররত্নে কন্যা-রত্নে শোভিত হইয়াছে, দেখিব সকলেই পাপমলিনতার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, সকলেই দেবতা এবং দেবী হইয়াছেন, আমি একবার সেই দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিব—আমার এই যে একমাত্র সাধ, ইহা কি এই জনমের সঙ্গেই ফুরাইবে? এ দেহ ভস্মীভূত হইবার সঙ্গে বিলীন হইবে?

"কিবা জন্মান্তরে মোর এই সাধ পূরাইবে?"

সে প্রাণভরা দৃশ্য না দেখিলে কিন্তু আমার ভাল করিয়া মরা হবে না—আমি মরিতে পারিব না! এ পঞ্চভৌতিক অথবা বহুভৌতিক দেহ শ্মশান-ধূলি হইবে, তাহাতে দুঃখ নাই; এ যত্নমার্জ্জিত দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নদী-সৈকতে পড়িয়া রহিবে তাহাতে আমার ক্ষোভ নাই; আসিয়াছি, ফিরিয়া যাইতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু যাহা বলিয়াছি—আমার প্রাণের সাধ পূর্ণ না হইলে, সে প্রাণভরা দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিতে না পাইলে, আমার ভাল করিয়া মরা হবে না—তাই আমার জিজ্ঞাস্য এ জন্মে না হইলেও জন্মান্তরে আমার সাধ পূর্ণ হইবে কি? আমি "দর্শন বিজ্ঞান" চাহি না, স্বর্গে আমার কাজ নাই, সালোক্যসাযুজ্যের আমি অযোগ্য, নির্ব্বাণ মোক্ষ আমার মত নরাধমার জন্যে নহে; আমি "পুনর্জন্ম" চাহি—এই জগতী-তলে বিচরণ করিয়া "কৃপা পাত্রী" হইব, দশজনের কাছে ভিক্ষা করিব, দশজনের "রাঙা মুখ" দেখিতে পারিব—এ প্রাণে সবই সহিবে—একদিন যদি মা'র মুখে হাসি দেখিতে পারি—তাহা হইলে আমার প্রাণে সবই সহিবে-আমি আমার সুখ দুঃখ বুঝি না—রাজার যেমন প্রজার সুখে সুখ, ভার্য্যার যেমন স্বামীর সুখে সুখ, মা'র যেমন সন্তানের সুখে সুখ, আমি ভিখারিণী আমার সর্ব্বস্ব ধন তুমি মা জন্মভূমি, তোমার সুখেই আমার সকল সুখ, তাই আমি "জন্মান্তর" চাহি। পরজন্ম আর কাহারও না থাকে, আমায় দিও জগদীশ! আমি তোমার এই অসীম কার্য্যক্ষেত্রে তোমার হইয়া তোমার কার্য্য করিব, এবার এ ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম ক্ষমতায় কুলাইল না—অনেক বাকি রহিল, জন্মান্তরে এসাধ পূর্ণ হইবে কি?—

"বিধি! তোরে সাধি শুন,
যদি জন্ম দিবে পুন,
আমারে আবার যেন রমণী জনম দিবে"

আমায় রমণী করিও প্রভো! লোকে শুনিয়া হাসে হাসুক, আমি রমণী-জন্মই প্রার্থনা করি। আমি পরাধীন—যখন হৃদয়হীন, কর্কশভাষী, মানবগুলার কাছে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইতে হয়, যাহারা অসত্যকে "সত্য" বলে, সেই গুলা যখন বিধাতা হইয়া দাঁড়ায়, তখনই আমরা পরাধীন—সেই অধীনতাই বড় দুঃখের। আর যখন দেবতার সম্মুখে

হাত যোড় করিয়া দাঁড়াই—জগদীশ! তোমার পবিত্রতা, তোমার মধুরতা, তোমার প্রদত্ত সদাশয়তা, যাঁহাদের হৃদয়কে "স্বর্গ" করিয়া রাখিয়াছে, সেই দেবতাদিগের সম্মুখে যখন হাত যোড় করিয়া দাঁড়াই, তখন—তাঁহাদিগের পবিত্র আদেশ পালন করিবার মত সুখের আর কিছুই দেখি না, এ সুখ রমণীরই একচেটিয়া!

আমায় রমণী জন্ম দিও প্রভো! আমি অবরোধবাসিনী বলিয়া আমার দুঃখ কিসে? যেখানে ভূত প্রেতের দৌরাত্ম্য, সেখানে অবরোধ প্রথা ত আমায় সাধিয়া লইতে হয়। তবে দেবমন্দিরে যাওয়ার অধিকার আমাদের চিরকালই আছে।

আমায় রমণীজন্ম দিও প্রভো! আমরা জ্ঞানহীনা সত্য, অজ্ঞানতা বড় ক্লেশকর তাহাও সত্য। কিন্তু যে জাতি, পুরুষজাতির শৈশবে মাতা, কৈশোরে ভাগিনী, যৌবনে ভার্য্যা. শেষে কন্যা, যে জাতির জন্যে পুরুষজাতির সমাজ বন্ধন, যে জাতিকে নিষ্পাপ ও নির্ম্মল দেখিতে পুরুষজাতির প্রাণপণ, সে জাতিকে অজ্ঞানাবস্থায় কতদিন রাখা যায়? আমি বেশ বুঝিতেছি, একদিন, যে জ্ঞানে আত্মগরিমা চূর্ণ হইয়া যায়, পরের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারা যায়, আত্মসংযম ও ত্যাগ স্বীকার অভ্যাস করা যায়, যে জ্ঞানে রমণীর, ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিগুলি উপযুক্তরূপে বিকসিত হয়, প্রতি মানব-পরিবার দেব-পরিবার বলিয়া প্রতীত হয়, সেই অমূল্য জ্ঞান আমাদিগকে সাধিয়া দিতে হইবে—নহিলে পুরুষের সংসার থাকিবে না, সমাজ চলিবে না; যিনি পরার্থপর, তিনি পরার্থপরতার জন্যে আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবেন; যিনি স্বার্থপর, তিনি আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবেন—স্বার্থেই হউক, পরার্থেই হউক, সর্ব্বত্রই রমণী।

আমাকে আবার রমণীজন্ম দিও প্রভো!—যে কুলে সীতা জন্মিয়াছেন, সাবিত্রী জন্মিয়াছেন, খনা জন্মিয়াছেন, লীলাবতী জন্মিয়াছেন, রাণী রাসমণি জন্মিয়াছেন, দেবী সোনামণি * জন্মিয়াছেন, স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা জন্মিয়াছেন, আর আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মা—সেই জগজ্জননী ভগবতী † জন্মিয়াছেন, সেই কুলে জন্মিলে আমি যতই নরাধমা হই না কেন, তবু আমার জাতীয় গৌরব রহিবে।

আমায় রমণীজন্ম দিও প্রভো!—মেয়ে যেমন মা'র মর্ম্ম বোঝে—আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত ছেলের কথা বলিতেছি না, মাট্সিনীর মত ছেলের কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি মেয়ে যেমন মা'র মর্ম্ম বোঝে, জগা খগার মত ছেলেরা সেরকম কোনও

* সোণামণি দেবী—জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা।

† বিদ্যাসাগরের মাতার নাম ভগবতী।

দিন বুঝিবে না। তাই বলিতেছি আমাকে রমণী জন্ম দিও, আমি মেয়ে হইয়া মা'র কাজে লাগিব।

আর এক কথা—যে দিন (সাধারণের অলক্ষ্যে) রমণীহস্ত মাতৃভূমির কার্য্যে নিয়োজিত হইবে, যে দিন রমণী গৃহ-শিক্ষয়িত্রী হইয়া পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী ও পিতার ত্রিবিধ ‡ উন্নতির সহায় হইবেন, যেদিন ঘরে ঘরে সকলেই সুমাতা, সুভগ্নী, সুভার্য্যা ও সুকন্যা হইবেন, যে দিন রমণীর মঙ্গলের জন্যে স্বদেশের মঙ্গলের জন্যে—জগতের কল্যাণের জন্যে রমণী-আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবে, রমণী হৃদয়ে পাপমলিনতার ছায়াও থাকিবে না—সেই শুভদিনেই বঙ্গসমাজ প্রকৃত উন্নত হইবে; আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—কিন্তু যে জাতির অভ্যুদয়ে এত বড় কাজ সাধিত হইতে পারে, বাঙ্গালির—"মুখ-সর্ব্বস্ব" কথাটা দূর হইতে পারে, আমি সেই জাতিতে পরিগণিতা হইব! সেই মহাসমুদ্রের এক জলবিন্দু হইব।—

তারপর—

"লাজ ভয় তেয়াগিব,
এ সাধ মোর পূরাইব"

এবার কিছুই পারিলাম না—বড় ক্ষোভ রহিল, এবার কিছুই পারিলাম না। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়া ছিলাম, যে কাজ করিতে প্রাণের প্রাণে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে কাজ এবার বুঝি করা হইল না। কেন?—আমি ভিখারিণী, তাহার জন্যে নহে; কাজ করিবার পক্ষে এই দরিদ্রতাপূর্ণ, এই স্নেহবন্ধন-শূন্য, এই জীবনকণাই যথেষ্ট। কর্ত্তব্য পালন করিতে রাজরাণীরও যেমন অধিকার, ভিখারিণীরও সেই রকম অধিকার; তবু আমার এবার বুঝি কিছুই হইল না, আমার বড় লজ্জা করে! ভাই যখন শ্রান্ত হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার কাছে গিয়া শুশ্রূষা করিতে পারি না, আমার বড় লজ্জা করে! গরিবের ছেলে রাস্তায় দাঁড়াইয়া যখন কাঁদে, "যাদু গোপাল" বলিয়া তাহাকে বুকে লইতে পারি না, আমার বড় লজ্জা করে! অন্যায় কথা শুনিলে প্রতিবাদ করিতে গিয়া সরিয়া আসি, আমার বড় লজ্জা করে! মোটে ঘোমটা খুলিতে পারি না—কি যেন ছাই, বড় লজ্জা করে! স্ত্রীস্বাধীনতার কথা শুনিলে—সামাজিক সাম্য ভাবের কথা শুনিলে, কেমন যে পোড়া মন, আমার বড় লজ্জা করে! তোমরা যাই বল, আমরা কিন্তু ঘোমটা খুলিয়া রাস্তার দাঁড়াইতে পারিব না, আমাদের বড় লজ্জা করে!—

তা শুধু কি লজ্জা, বড় ভয়ও করে। যে কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়া, এ দেহ এ জীবন সফল করিব ভাবি, তা করিতে পারি না, আমার বড় ভয় করে! দেশে দেবতা কয় জন, আর প্রকৃত মানব কয় জন, তা ছাড়া ভূত পিশাচেরই ছড়াছড়ি; অত ভূতের গল্প শুনিয়া

‡ ত্রিবিধ উন্নতি—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।

এখন রাত্রি দিন আমার বড় ভয় করে! তাহারা নাকি সজ্জনদেশ লইয়াও হাসে, ধার্ম্মিককেও গালি দেয়, ভাল কাজ করিলেও কলঙ্ক করে, শুনিয়া শুনিয়া বড় ভয় করে! তাহারা নাকি পরের সুখ দেখিতে পারে না, শান্তি সহিতে পারে না। "উন্নতি" দেখিলে পুড়িয়া মরে! শুনিয়া আমার কেবলই ভয় করে! সকল কথা গুলা বলিতে পারিলাম না—বলিতেছি আমার ভয় করে।

কিন্তু যেদিন আমি পরজন্ম পাইয়া আসিব—সেই শত বৎসরের পরে কি সহস্র বৎসরের পরে যখন মা'র কোলে ফিরিয়া আসিব, তখন আর এমন দিন রহিবে না। শীতের পরে বসন্ত, অমাবস্যার পরে পূর্ণিমা, অবনতির পরে উন্নতি, অবশ্যম্ভাবী। তাই এক দিন যাহারা নগ্ন দেহে বনে বনে বেড়াইত, আজি আর্য্যসন্তানদের পরিচ্ছদের হীনাবস্থা দেখিয়া তাহারাই উপহাস করে।—আজি আর্য্যসন্তানেরা তাহাদের প্রদত্ত পরিচ্ছদে কৃতার্থ! তাই বলিতেছি শত বৎসর পরেই হউক, আর সহস্র বৎসর পরেই হউক, এক দিন দেশের গতি ফিরিবে, আজি যাহারা হিরণ্যকশিপু, তাহাদের বংশে প্রহ্লাদ আসিবে; ধর্ম্মের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, পরোপকারের জন্যে সকলে শরীর ও প্রাণ উৎসর্গ করিবে। একদিন সমস্ত জগৎ একপরিবার হইবে, সকলে ভাই, সকলে ভগিনী হইবে, যাহার যাহা প্রকৃতি দত্ত অলঙ্কার, সে তাহা মাজিয়া ঘসিয়া লইবে; সে রাজ্য স্বর্গ রাজ্য হইবে, পুরুষগুলি দেবতা হইবেন, মেয়েগুলি দেবী হইবেন, সকলেই সকলের শরীর মন ও আত্মার উন্নতির সহায় হইবেন—সে শুভ দিনে, সে অমৃতময় দিনে আমি লজ্জাই বা করিব কেন, ভয়ই বা করিব কেন?—দেবদেবীদের কাছে লজ্জা সঙ্কোচই বা কিসে? ভয়ই বা কিসে?—তাই সেদিন লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া" আমার "সাধ" পূর্ণ করিব—সে কি?—

"সাগর ছাঁচা রতন নিব, কণ্ঠে রাখ্‌ব নিশি দিবে!"

ইহাই আমার একমাত্র সাধ! এই হইলেই আমার সম্পূর্ণ সুখ! এই সুখের আশায় মরিয়া পুনরায় জন্ম পাইতে—রমণী জন্ম পাইতে চাহি। ওমা জন্মভূমি! তুমিই আমার সেই অমূল্য, দেব দুর্লভ রত্ন! তুমি অতল শোক সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছ—ইংরাজ রাজা হইয়াছে বলিয়া নহে।—বরং ইংরাজ রাজা হইয়াছে বলিয়া কেবল "দলাদলি" হইয়া কেবল "মুখোমুখি" হইয়া দেশীয়েরা ক্ষান্ত হইতেছে; নয় তো দুইবেলা বুঝি "ভাই ভাই" মারামারি, কাটাকাটি, খুনোখুনি হইত!—সে দিন এক মীরজাফরের জ্বালায় জ্বলিয়াছিলে, ইংরাজ রাজা না হইলে বুঝি শত সহস্র মীরজাফরের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতে! তাই বলিতেছি ইংরাজ রাজত্বে তোমার সুখ থাক্ না থাক্, শান্তি আছে। তুমি

শোকসাগরে ডুবিয়াছ, ছেলেদের নিষ্ঠুরতা আর পরমুখাপেক্ষিতার জন্যে! মেয়েদের অবহেলা আর বিবিয়ানার জন্যে! তুমি ডুবিয়াছ মা অনৈক্যতার জন্যে—আর ডুবিয়াছ মা গলা বাজির জন্যে!!

যে দিন দেবতার আশীর্ব্বাদে তোমার নারদ ব্যাস, বশিষ্ঠ, ফিরিয়া আসিবেন, যে দিন, রঘু, রাম, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, প্রতাপ, বাদল প্রভৃতি তোমার কোলে আসিবেন, যে দিন সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, প্রভৃতি তোমায় আবার মা বলিয়া ডাকিবেন, যে দিন হরপার্ব্বতী ঘরে ঘরে বিরাজ করিবেন, পার্ব্বতী আবার মা অন্নপূর্ণা হইয়া দাঁড়াইবেন, যেদিন আবার পান্না, কর্ম্মদেবী প্রভৃতি মিবার উজ্জ্বল করিবেন—সেই শুভদিনে মহাসাগর মন্থন করিয়া তাঁহারাই তোমাকে উদ্ধার করিবেন।—সেই দিনে সেই স্বপ্নময় অভীষ্ট লাভের দিনে, আমার চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, আমার চিরতপস্যার ফল মিলিবে, সেই দিন মা আমার সাগর ছাঁচা রত্ন! আমার চির বাঞ্ছিত নিধি! তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া, ভিখারিণী আমি রাজরাজেশ্বরীর অধিক সুখ ভোগ করিব। আমি ভিখারিণী—আমি সোণার হার বা মুক্তার হারের গৌরব বুঝি না, আমি সংসার-বন্ধন শূন্যা রমণী-কণ্ঠে আর কোন্ হার বাঞ্ছিত, তাহাও বুঝি আমার মনে পড়ে না, আমার কেবল তুমি—আমার সর্ব্বস্বধন তুমি! আমার কণ্ঠ-রত্ন তুমি! যদি আমার "আমার" বলিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি! যদি আমার ভাল বাসিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি! আমার বুক পুরাইবার কেবল তুমি! এস! আমার সব! আমার সমুদ্র-নিহিত রত্ন! আমার প্রাণের প্রাণে লুকাইবে, এস! তোমায় দিবানিশি কণ্ঠে রাখিব!

ইহাই আমার গান, আমি এই গান গাহি, জন্মে জন্মে গাহিতে চাহি। যতদিন আমার মা'কে না পাইব, আমার সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রসাদে সিদ্ধিলাভ না করিব, ততদিন আমি এই গীতি গাহিব, এই তপস্যা করিব! লোকের দুয়ারে ভিক্ষা করিতে গিয়া গাহিব, নীরব নিভৃতে বসিয়া গাহিব, বাসন্ত কাননে "বউ কথা ক" যখন মধুর হিল্লোলে আকাশ মাতাইবে, তখন তাহার সঙ্গে গাহিব, বর্ষার আকাশে কাদম্বিনী যখন বজ্র নিনাদে জগৎ চমকিত করিবে, তখন তাহার সঙ্গে গাহিব, অগ্নিময় মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া গাহিব, শ্মশানের সৈকতে পড়িয়া গাহিব, জীবনে মরণে কেবল এই গানই গাহিব—আর যে কবি এই প্রাণময়ী গীতির রচয়িতা তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতার প্রণাম দিতে থাকিব।*

---

* শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃত "মৃণালিনী" দেখ।

যদি কাহারও ভাল লাগে, সে আমার গান শুনিবে—নচেৎ সকল শব্দের যেখানে শেষ সীমা, কোকিল, শ্যামা, বুলবুল, কাক, চীল, ফিঙা, সকলের গীতির যেখানে পরিণাম, আমার গানও সেইখানে ফিরায়া যাইবে, সেই মহা-শূন্যের যিনি অধীশ্বর, তাঁহারই চরণে পৌঁছিবে, আমি অন্য শ্রোতা চাহিনা!

"কেমন, শুনিলে তো?"

শুনিলাম বটে!! ভিখারিণীর আবল তাবল বকুনিতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, অর্দ্ধ চন্দ্রের কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম! আপদ বিদায় হইলেই বাঁচি, তাই তাড়াতাড়ি ভিক্ষা দিতে গেলাম, কিন্তু সে লইল না, হাসিয়া হাসিয়া বলিল "তোমার নিজের ঘরেই চা'ল বাড়ন্ত, তা আমায় দিবে কি?" আমি অবাক্ হইলাম।

ভিখারিণী যে পাগল সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, পাঠিকা ভগিনীরও বোধ হয় তাই। কিন্তু সেই অবধি, কি করিয়া কে জানে, আমি তো জানি না, সেই ছাই গান তো আমার ভাল লাগিয়াছিল না, তবু আমায় যেন 'স সে মি রা'য় ধরিয়াছে, সেই অবধি উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, জাগিতে, ঘুমাইতে, আমার প্রাণের প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে?"—ভাই, তোমার প্রাণে কি দাগ পড়িবে না? স্নেহময়ী পাঠিকা ভগিনি! তুমি কি আমায় একবিন্দু সহানুভূতি দিবে না?

শ্রী ম—

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

উপসংহার।

"শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী" এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তি লইয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। (১) ইহার কোনওটীর অভাবে মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়; একটীকে খাটো করিয়া অপরটীকে বড় করিলে মানুষকেও "অর্দ্ধ মাত্রার মনুষ্য" হইতে হয়; আমাদিগের দেশের কোন ভক্তিভাজন ও সুবিখ্যাত লেখক এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন; আমাদেরও সহজ জ্ঞানে এই কথার সত্যতা অনেক বোধগম্য হয়। কিন্তু জাতীয় চরিত্র—স্ত্রী পুরুষের বৃত্তিগুলি স্বতন্ত্র রূপে অনুশীলিত হওয়াই আমাদের স্বাভাবিক নিয়ম। তাই বঙ্গমহিলার জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির মধ্যে ধারণা,

(১) এ বিষয়ে যিনি সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" দেখিবেন।

কল্পনা, স্মৃতি, ইহার কোন একটীকে হীনপ্রভ দেখিলে আমরা যত ক্ষতিগ্রস্ত মনে না করি, কার্য্যকারিণী বৃত্তির মধ্যে যাহা ধর্ম্মনৈতিক বৃত্তি বলিয়া আখ্যাত,—সেই স্নেহ, ভক্তি, দয়া, লজ্জা, ক্ষমা, ইহার মধ্যে কোন একটীকে হীনপ্রভ দেখিলে আমাদিগকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত মনে করি। আমাদের পুরুষেরা জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি বাড়াইতে গিয়া কার্য্যকারিণী বৃত্তি হ্রাস করিতেছেন, স্ত্রীলোকেরাও সুরুচি ও সভ্যতার গোলোযোগে ইহা হারাইতে বসিয়াছেন, এই শেষোক্ত দিগকে লইয়াই আশঙ্কা বেশী। "নিষ্ঠুর মেয়ে, পাহাড়ে মেয়ে, নির্লজ্জ মেয়ে" (২) প্রভৃতি অস্বাভাবিক প্রকৃতিসম্পন্না রমণী জগতের চক্ষুঃশূল; ইহার কাছে "বোকা মেয়ে, মূর্খ মেয়ে" বরং সহনীয়।—ভরসা করি একথায় কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে দুর্ভাগ্য বঙ্গমহিলাগণের মূর্খতা বা নির্ব্বোধতার সমর্থন করা আমার অভিপ্রেত। আমাদের দেশের একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়াছেন "সন্তান মূর্খ হইয়া সৎ হয়, তাহাও ভাল; তথাপি অসৎ বিদ্বান্ সন্তান নিষ্প্রোয়জন"। এই কথাটীর ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আমার উপরি উক্ত সামান্য কথাটী লইয়া গোলযোগ হইবে না।

স্বার্থবিস্মৃতি, পরহিতে আত্মসমর্পণ, ধর্ম্মের উদ্দেশে গৃহধর্ম্ম-পালন ও সমাজ সেবা, ঈশ্বরে অটল ভক্তি ও বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অসীম দৃঢ়তা, স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি ও দয়ার অলৌকিক মহানুভবতা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার উচ্চাশয়তা, লজ্জা, নম্রতা, ক্ষমা ও কৃতজ্ঞতার মনোহর ভাব, এই সকল উপকরণ একত্রে সমাবেশ করিয়া যে পদার্থ গঠিত হয়, বঙ্গমহিলা সেই পদার্থ। হীনত্ব দেখিলে বঙ্গ মহিলা জলন্ত অগ্নিশিখা, মহত্বে তাঁহারা হিমশিলা, একাধারে কবি ভবভূতির সেই

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।"

অতএব যাঁহারা বঙ্গ মহিলার জীবন পরিচালক, তাঁহারা বঙ্গমহিলার "বঙ্গমহিলাত্ব" মনে রাখিবেন। যেমন বাঙ্গালির ছেলে সাহেব সাজিলেই উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবেন না, সেইরূপ বঙ্গমহিলাও 'উন্নতির পরিচায়ক'

(২) লজ্জা ও বিনয় রমণীকুলের যথার্থ আভরণ একথা আজ নূতন বলিতেছি না, বহুকাল পূর্ব্বে অনেক জ্ঞানীরাও বলিয়াছেন—"নির্লজ্জাশ্চ কুলাঙ্গনাঃ।" তবে বর্ত্তমান কালে শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে গিয়া অনেক রমণী নির্লজ্জা হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া লজ্জায় মরিতে হয়; আর এক কথা, বর্ত্তমান সময়ে অনেক পুরুষ কবি, এক একটী কবিতায় এরূপ কুরুচি ও কুভাবের পরিচয় দেন যে তাহা দেখিয়া ঘৃণা ও রাগে, সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠে—আমরা করযোড়ে প্রার্থনা করি যেন লজ্জাশীলতা ও পবিত্রতার পূর্ণ ছবি বঙ্গরমণীর লিখিত কবিতায় ঐরূপ কবিত্বের ছায়াও না পড়ে। তাহা দেখিবার পূর্ব্বে মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়। আর দুর্বিনীতা নারী, সে তো শ্মশানের ডাকিনী! অধিক বলা বাহুল্য।

নহে। তাই বলিতেছি স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসল মহোদয়েরা বঙ্গমহিলাকে বঙ্গমহিলা করিয়াই গঠন করিবেন।

উপসংহার কালে বলিতেছি মুখে যিনি যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ বঙ্গবাসীগণ, সকলে সমবেত হইয়া দেশীয় অবলাগণের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা না করিলে ইহাঁদিগের অবস্থা সম্যক্ প্রকারে উন্নত হইবেক না। যে দিন দেখিব কন্যার জন্ম মাত্রে পিতা মাতা দুর্ভাবনায় আকুল হন না, বালিকার শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিণেয় যুবকের মনস্তুষ্টি বলিয়া অভিভাবকদিগের ধারণা হয় না, বিদ্যালয়ে স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা পাইতে বালিকার ত্রুটী হয় না, সুশিক্ষা সুদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে বালিকাকে ক্লেশ পাইতে হয় না, কৃতবিদ্য যুবকগণ অর্থলোভে কুমারী পাণি গ্রহণে অগ্রসর হন না, পিত্রাদি অভিভাবকেরা অর্থ বা বংশ মর্য্যাদায় ভুলিয়া অথবা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া অপাত্রে কন্যা দান করিয়া রমণী-জীবন বিভীষিকাময় করেন না, যে দিন অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গাঙ্গনাদিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা, শিল্প ও গৃহকার্য্য প্রণালী রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইবে, অযথা শাসন ও অন্যায় অধীনতার হস্ত হইতে বঙ্গাঙ্গনার মুক্তিলাভ হইবে, বঙ্গীয় রমণী অবরোধবাসিনী ও অবগুণ্ঠনবতী হইয়াও পবিত্রতাপূর্ণ, শান্তিময়, শিক্ষাপ্রদ ও বিশুদ্ধ আমোদজনক স্থানে, আত্মীয় পুরুষদিগের সঙ্গে যাইতে সক্ষমা হইবেন, যে দিন বঙ্গাঙ্গনা, পুরুষদিগের হস্তে ক্রীতদাসীর পরিবর্ত্তে যথার্থ দেবীর ন্যায় সমাদৃতা ও সম্মানিতা বিবেচিত হইবেন, যে দিন বঙ্গাঙ্গনা সুশিক্ষা ও সদিচ্ছা প্রভাবে আদর্শ ভগিনী, আদর্শ ভার্য্যা ও আদর্শ কন্যা এবং আদর্শ গৃহিণী হইয়া দেশের পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গল সাধনে যত্নবতী হইবেন, মহদাশয়া রমণীগণ নারীজাতির নেত্রীরূপে তাঁহাদিগকে উন্নতি পথে—*চতুর্ব্বিধ বৃত্তির সামঞ্জস্যে ত্রিবিধ উন্নতি পথে লইয়া যাইবেন, যে দিন তাঁহারা সাধারণের চক্ষুর অগোচর থাকিয়াও দেশের সমস্ত পবিত্র এবং মঙ্গলময় কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের পবিত্র শক্তি ও মঙ্গলেচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যে দিন দেশের প্রত্যেক নর নারী, পরস্পরের প্রতি বিশুদ্ধ ভ্রাতৃ ভগিনী ভাব বিতরণ করিতে পারিবেন, এবং পুরুষেরা রমণীগণের নিকটে যথার্থই রক্ষাকর্ত্তা ও দেবোপম চরিত্রবান্, বলিয়া বিবেচিত হইবেন, সেই দিনই বুঝিব যে এত দিনের পরে বামাহিতার্থীর আশা যথার্থই পূর্ণ হইল, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা বাস্তবিক উন্নত হইল, এবং বঙ্গদেশ সত্য সত্যই উন্নতি

* চতুর্ব্বিধ বৃত্তি, শারীরিক, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী,। ত্রিবিধ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।

পথে অগ্রসর হইল। আহা! কল্পনা-চক্ষে সে শুভদিন দেখিয়াও হৃদয়ে কত না সুখের উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে!

"কবে বামাগণ হয়ে সুশিক্ষিতমনা,
হিতকর নানা গ্রন্থ করিবে রচনা,
জ্ঞান-শিক্ষা ধর্ম্মদীক্ষা করিবেক দান,
প্রাণপণে সাধিবেক স্বজাতি-কল্যাণ?
বিবাদ কলহ স্থানে হইবে সদ্ভাব,
আলস্য ঘুচিয়া হবে পরিশ্রম লাভ।
রূপের স্থানেতে হবে গুণের গৌরব,
স্বার্থ ছাড়ি ধর্ম্মে মন দিবে নারী সব।
সতীত্ব, নম্রতা, লজ্জা, দয়া, সুশীলতা,
ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধুচেষ্টা, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা,
সকল পবিত্র গুণ করিয়া ভূষণ,
গৃহলক্ষ্মী সম শোভা করিবে ধারণ।
কবে হবে অন্তঃপুরে নারীর সমাজ,
হইবে ঈশ্বর-পূজা নানা সাধুকাজ?
কবে ভ্রম মোহ সব হইবে সংহার,
সত্য ধর্ম্ম সকলের হবে কণ্ঠহার;
ধর্ম্মের অধীনে নারী হইবে স্বাধীন,
মনের আনন্দে সুখে রবে চির দিন?"

(নারীশিক্ষা ১ম ভাগ)

বিদ্যাসাগরের জননী।

২য় প্রবন্ধ।

পূর্ব্ববারে বলা গিয়াছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কেমন স্নেহের সহিত হ্যারিসন সাহেবকে আহার করাইতে করাইতে সদুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে কেমন দরিদ্রদের বন্ধু হইতে—বিপন্নের সহায়তা করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন! পূর্ব্ববারে বলা হইয়াছে তিনি কেমন প্রেম-প্রণোদিত হইয়া সতত সকলের বাড়ীতে সেবা করিয়া বেড়াইতেন। পূর্ব্ববারে আরও বলা হইয়াছে তিনি নিজের ও নিজ পরিজনের অসুবিধা ও ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া অপর দশ জনের সুবিধা ও আরামের জন্য নূতন লেপ কয়খানি শীত-ক্লিষ্ট দরিদ্র পরিবারবর্গকে দান করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল সদনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার জীবনকে পুণ্য কীর্ত্তিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই এইরূপ কোন না কোন প্রকার সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতেন। লোকের সেবা লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি, লোকের দুঃখ কষ্টে সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বদাই তাহাদিগকে আপনার করিতেন। বঙ্গরমণী যে পরদুঃখকাতর—বঙ্গললনা যে নানাপ্রকার অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিয়া আত্মীয় স্বজন ও অপর দশ জনের সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারেন, বিদ্যাসাগর-জননী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের প্রধান অধিনায়ক হইয়াছিলেন, তাঁহার যে আয়োজন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে বিধবাবিবাহ

প্রচলিত হয়, সেই গুণবতী উদার-হৃদয়া রমণীই সে মহাব্যাপারের মূলে লুক্কায়িত ভাবে দণ্ডায়মানা। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তখন তাঁহার জননী তাঁহাকে সে কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।*

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-সম্মত, বিধবাদের জন্য যদি চেষ্টা করি, তাহাতে তোমার মত কি? তখনি সেই বঙ্গললনা অশ্রুপূর্ণনয়নে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপ, যে হত-ভাগিনীদের সকল আশা ভরসা ফুরাইয়াছে, যাহারা ঘরের বালাই হইয়া দাস দাসীর ন্যায় পড়িয়া থাকে, সকলপ্রকার মঙ্গল কর্ম্মে লোকে যাহাদিগকে অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া মনে করে, কোন শুভকর্ম্মে যাহারা যোগ দিতে পায় না, দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুজল যাহাদের একমাত্র সম্বল, তাহাদিগকে সংসারে সুখী করিতে ইহাতে আবার আমার মত কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? যদি কোন উপায় থাকে, তবে এখনই তাহার চেষ্টা কর!"

বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার আদেশ ও জননীর সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া বীর পরাক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, বিধবাবিবাহ আরম্ভ হইল। এক একটি করিয়া অনেকগুলি বিধবাবিবাহ বিদ্যা-সাগর মহাশয় সম্পন্ন করিলেন, জননী পশ্চাৎ হইতে নানাপ্রকার উৎসাহ বচনে পুত্রকে আরও অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য এই যে যখন দেশের অধিকাংশ লোক নানাপ্রকার নিন্দাবাদে ও সামাজিক উৎপীড়নে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন সেই সহৃদয়া জননী প্রসন্নবদনে সস্নেহবচনে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের চিত্ত-বিনোদনে প্রয়াস পাইতেন। তিনি যখন দেশের লোক-দের দুর্দ্দশা ও অপদার্থতা দেখিয়া শোক প্রকাশ করিতেন, জননী তখন নানা-প্রকার মিষ্ট বচনে তাঁহার অন্তরে বলবিধান করিতেন। একবার কয়েকটী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ হও-য়ার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে নবীনা বধূদের কেহ কেহ তাহাদের জাতি গিয়াছে বলিয়া ঘৃণাপ্রদর্শন করায় সেই মেয়ে কয়টি দুঃখিত অন্তরে গৃহের এক প্রান্তে দাঁড়া-ইয়া রোদন করিতেছিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী মেয়ে কয়েকটিকে একান্তে রোদন করিতে

---

* জনশ্রুতি আছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী প্রায়ই এক বালবিধবাকে পুত্রের নিকট উপস্থিত করিয়া বলেন "ঈশ্বর, তোদের পোড়া শাস্ত্রে কি এদের সদ্গতির জন্য কোন বিধান পাওয়া যায় না?" তাহাতেই তিনি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বৃত্তান্তটী সত্য বলিয়া অনুমোদন করেন নাই। লেখক।

দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কারণ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে আদর করিয়া বলিলেন, "বাছা, ওরা ছেলে মানুষ ওদের কথায় কি রাগ করিতে আছে? না বুঝিয়া কি বলিতে কি বলিয়াছে, ও কথায় কাণ দিতে নাই।" এই বলিয়া তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলেন। তখন তাঁহাদের আহারের সময়, আহারের আয়োজন হইয়াছে। সেই মেয়ে কয়টিকে লইয়া এক পাত্রে আহার করিতে বসিলেন। একবার নিজে আহার করেন, আবার একবার তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দেন। এইরূপে তাহাদিগকে লইয়া আহার করিতে করিতে বলিলেন "দেখ, তোমাদের জাতি যায় নাই, তাহলে কি আমি তোমাদের নিয়ে এক পাত্রে আহার করিতাম? তোমাদের জাতি যায় নাই। এই ত তোমাদের নিয়ে এক পাতে আহার করিলাম, আবার যারা তোমাদের জাতি গিয়াছে বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছে, তারাও আমার পাতে খাইবে। তোমাদের জাতি যায় নাই।" কেমন উদারতা! এমন উদারতা, এমন সহৃদয়তা, এমন কোমল ভাবের আধার সেই জননীর ক্রোড়ে বিদ্যাসাগর লালিত পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া আজ বঙ্গের গৃহে গৃহে তাঁহার স্তুতি বন্দনা হইতেছে!

বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কিম্বা সীতার বনবাস লিখিয়া বড়লোক হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্রজনে অর্থ সাহায্য করিয়াও বড় লোক হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট কলেজের স্থাপয়িতা বলিয়াও বড় লোক হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক দুর্নীতি ও কদাচারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিয়া বালবিধবাদিগের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া বড় লোক হইয়াছিলেন। একজন পুরুষ ইচ্ছা করিলে স্ত্রী বর্ত্তমানে কিম্বা অবর্ত্তমানে গঙ্গাযাত্রার কাল পর্য্যন্ত যত ইচ্ছা বিবাহ করিবে। কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধকে পতিত্বে বরণ করিয়া অনতিকাল মধ্যে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন আপন ভাগ্যকে নিন্দা করিতে করিতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবে। অপর দিকে উক্ত বালিকার পূজ্যপাদ পিতৃদেব হয়ত শতাধিক বিবাহ করিয়া পরমানন্দে শ্বশুরাগারে কালাতিপাত করিতেছেন। বিদ্যাসাগর ইহারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া—ইহাই সংশোধনে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া বড় লোক। আর তাঁহার জননী—সেই পুণ্যবতী জননী প্রসন্নসলিলা তটিনীর ন্যায় বিদ্যাসাগররূপ মহাবৃক্ষের সরসতা ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারই উৎসাহ-বলে—তাঁহারই সুপরামর্শে বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের ব্রত পালনে

কৃতকার্য্য ও ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন। না যদি হয়, তবে যেন এমন নাই হয়। কবে এমন সুদিন হইবে, যে দয়া প্রেম ও পুণ্যের প্রতিমা বিদ্যাসাগর জননীর ন্যায় গরীয়সী জননী বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করিবেন এবং তাঁহাদের পবিত্র হস্তে গঠিত হইয়া আমাদের দেশের বালক বালিকাগণ মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদনে সক্ষম হইবে ?

ললিতমোহিনী দেবী।

পাঠক পাঠিকাকে বোধ হয় অধিক যত্ন সহকারে বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে, এদেশে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ-কুমার অনেক—এমন কি শতাধিক কুলীন ব্রাহ্মণকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। এই কুপ্রথা যে একবারে বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছে, তাহা কখনও বলিতে পারি না ; তবে এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ইহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে মাত্র। পীড়া আছে, নিঃশেষ হয় নাই, একটু উপশম মাত্র লক্ষিত হয়। রোগ হিন্দুসমাজ-দেহে প্রবেশ করিয়া জর্জ্জরীভূত করিতেছে। সমাজ মৃতপ্রায়। কত কুলকামিনী অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে ও অদ্যাপিও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই প্রবন্ধের শীর্ষস্থানে যাঁহার নাম, তিনি সেই অভাগিনীদিগের মধ্যে একজন। তাঁহার দুঃখের জীবন বৃত্তান্ত সজলনয়নে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এতৎপাঠে নিতান্ত কঠিন হৃদয়ও অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

ললিত মোহিনী কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা, কুষ্টিয়ার অন্তর্গত চাপড়ায় বাস করিতেন ইহার পিতা অর্থগৃধ্নু হইয়া নিজ কুল গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া অতি শৈশবাবস্থায় পূর্ব্বদেশীয় একজন গণ্যমান্য জমিদারের সহিত ইহার বিবাহ দেন। বালিকা শ্বশুরালয়ে সুখে বাস করিতে বা দীর্ঘকাল থাকিতে পায় নাই। শাশুড়ীর সহিত সদ্ভাব হয় নাই। ইহাতে আমরা ললিতকে দোষ দিই না, কারণ সেতো বালিকা, সে কি জানে ? মুখে এখনও স্তন্য দুগ্ধের গন্ধ আছে, সে ভাল মন্দ কি জানে ? সে জানিত (যেমন সকল শিশু বধূ জানে) যে, পিত্রালয়ে যে প্রকার আদর পাই, শ্বশুরালয়েও সেই প্রকার পাইব। আহা! অভাগিনী এই মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল, অচিরে জানিতে পারিল যে, মরীচিকা অনন্ত উত্তপ্ত বালুকা-রাশিতে পরিণত, উত্তরোত্তর তাহার সংসার-সুখ-পিপাসা বাড়াইয়া ব্যথিত করিতে লাগিল। শাশুড়ী কঠিনহৃদয়া বধূপীড়নপ্রিয়া ছিলেন। বধূকে অশেষ প্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন। কুমারীর

প্রাণে সকলই সহিল। ইহা করিয়াও কর্ত্রী ঠাকুরাণী ক্ষান্ত রহিলেন না। ষড়্যন্ত্র আরম্ভ করিলেন, করিয়া জীবনের একমাত্র সহায় স্বামীর বিরাগ উৎপাদন করিলেন। ললিতের স্বামী পুনরায় বিবাহ করিলেন! জন্মের মত ললিতের সুখ-রবি অস্তমিত হইল। শুধু ইহা নয়। তিনি পাগল হইয়াছেন, এই কথা বিঘোষিত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা মানব লীলা সম্বরণ করেন। তিনি বিধবা জননীর নিকট রহিলেন। তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কথা মধুর ছিল। তিনি লেখা পড়াও জানিতেন। স্বামিলাভের জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না। শেষে বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। স্বামী পাইবার জন্য তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু স্বামী পাইলেন না, প্রচুর অর্থ পাইলেন। যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বেশ স্বচ্ছন্দে দিন নির্ব্বাহ হইত। তিনি চাহিলেন স্বামী,পাইলেন অর্থ। বিধাতার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইল। তিনি পরম করুণাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। কৌলীন্য-কালকূটে তাঁহার পবিত্র হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। তিনি সুযোগ পাইলেই কৌলীন্য ও বাল্যবিবাহের বিষম অপকারিতার বিরুদ্ধে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। নানাপ্রকার মনোবেদনা পাইয়া ললিতমোহিনী দেবী বৎসরাধিক হইল কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি স্বকৃত উইলে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পর বাল্য বিবাহের বিপক্ষে ও তাঁহার নিজের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে ৩০০৲ তিন শত টাকা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা এই হিন্দু মহিলার জীবন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত নহি। সমস্ত বিবরণ পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হই নাই। যাহা পাইয়াছি, তাহা এস্থলে প্রকটিত হইল। ইঁহার ক্ষুদ্র জীবন বাস্তব দুঃখের ছবি।

হিন্দুসমাজ! দেখিতেছ না, জানিতে পারিতেছ না যে, আপনার পাপ আগুণে আপনি ছারখার হইয়া যাইতেছ। সধবা, বিধবা ও সধবাবস্থায় বিধবা কত বালিকার প্রাণ জীবন্তে দগ্ধ করিতেছ। সুকুমারী বালিকাদিগের অশ্রু কি তোমার পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করিতেছে না? তাহাদিগের আর্ত্তনাদ কি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না? তাহাদিগের অকালমৃত্যুতে সকলেই সন্তপ্ত হইতেছে, কেবল তুমিই নও। সংস্কারকগণ! অগ্রসর হউন! অদ্য এক ললিতমোহিনীর নামোল্লেখ করিলাম, এইরূপ কত শত বালিকার যে কি দশা হইতেছে, তাহা কি আপনাদিগের কখনও কর্ণগোচর হয়! হইলেই

না কি হইবে, আপনারা কি তন্নিবারণ জন্য কোনওরূপ উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত? বেশী করিলেন তো একটু বীতরাগ হইলেন, দুই একবার হা হু করিলেন। ইহাতে কি কোনও গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে? সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন" এই প্রতিজ্ঞা অবলম্বনপূর্ব্বক সমাজের কুপ্রথা সকলের সমূলোন্মূলনে সচেষ্ট হউন্।

নূতন সংবাদ।

১। মুক্তিফৌজের সংস্থাপক দরিদ্র ও পাপীর বন্ধু জেনারল বুথ কলিকাতায় ৫ দিন থাকিয়া নানাস্থানে বক্তৃতাদি করিয়া বহুলোককে দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছেন। কলিকাতায় পতিতা রমণীদিগের উদ্ধারার্থ একটী গৃহ এবং রাজ দ্বারে অপরাধী ব্যক্তিদিগের সংশোধনার্থ একটী আশ্রয় স্থান করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইঁহার শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

২। জাতীয় মহাসভার (কনগ্রেস) অন্যতর সম্পাদক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ সম্প্রতি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার মত সুবিজ্ঞ, উৎসাহী ও সাধারণের প্রিয় দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতি বিরল। ইঁহার অকাল মৃত্যুতে ভারতমাতা একটী অতি উপযুক্ত পুত্র হারাইলেন।

৩। বিলাতের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। আমেরিকায় একপ্রকার গায়ক বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পত্র সকল বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সুন্দর সুস্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে।

৫। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, আণ্ডামান দ্বীপের যে স্ত্রী-দায়মালগণ ঝটিকাপীড়িত জলমগ্ন লোকদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন, তাহাদের নেত্রী বাঙ্গুরণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, অন্যান্য বন্দিনীদিগের প্রতিও কিছু কিছু অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। সকলে খালাস পাইলেই ভাল হইত।

৬। আমাদের যুবরাজপত্নী সৈনিকদিগের নিকট চাঁদা করিয়া প্রায় ১৬ হাজার টাকা তুলিয়া বিবী গ্রিমউডকে উপহার দিয়াছেন।

৭। বিলাত হইতে বড় শোচনীয় সংবাদ আসিয়াছে। ভারতের ভাবী সম্রাট প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর ১৪ই জানুয়ারি ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শুভবিবাহ সম্বন্ধ ঠিক্ হইয়াছিল, আর এক মাসের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন হইত। জগদীশ্বর এই বিষম শোকে ভারতেশ্বরী ও রাজপরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে শান্তিবিধান করুন্।

বামারচনা।

মা।

কি সুমিষ্ট মার নাম কি আছে এমন,
তাপিত অন্তরে করে অমৃত সিঞ্চন ;
মা বলে ডাকিলে ভয়ে ভয় দূর হয়,
দুর্ব্বলের প্রাণে হয় বলের উদয় ;
দারুণ রোগের ক্লেশ অসহ্য হইলে,
শান্তি পাই স্বস্তি পাই মা বলে ডাকিলে।
শিশুকাল হতে মাতা করেন যতন,
নিজ রক্ত দিয়া পুত্রে করেন পালন,
ভূমিষ্ঠ হ'বার আগে উদরেতে লন,
সন্তানের তরে তিনি কত কষ্ট সন,
সন্তান জন্মিলে পর তার সব ভার
লইয়া করেন নিজ সুখ-পরিহার।
যেমন পশুরা ভাল নাহি বাসে আর,
যখন ছানার হয় বৃহৎ আকার,
তেমন কখনো নহে মানবের প্রাণ
বড় হইলেও থাকে পরাণের টান,
সন্তানের যদি হয় কিঞ্চিৎ উন্নতি,
জননী তাহলে হন অতি হৃষ্টমতি।
সন্তানের সুখে সুখী দুঃখে হন দুঃখী,
শুনিতে মুখের কথা থাকেন উন্মুখী।
যখন সে ডাকে মাকে আধ আধ স্বরে,
তখন মা কোলে লন অতি স্নেহভরে।
বিদেশে যদ্যপি যায় প্রাণের কুমার,
মায়ের পরাণ স্থির নাহি থাকে আর ;
কিছুতে না পান সুখ শয়নে ভোজনে,
পুত্রমুখ জাগরূক নিরবধি মনে ;
আইলে আলয়ে পুনঃ প্রাণের পুতুলি,
চুমি মুখ পাতি বুক লন কোলে তুলি।
এমন মানুষ নাকি আছে পৃথিবীতে
অবহেলা করে মাকে ভকতি করিতে ?
যে করে তাহার নাম নরাধম হয়,
প্রকৃত মানুষ সেত কখনই নয়।

কুমারী বনলতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বরাহনগর মহিলাশ্রম।

প্রেম।

প্রেমের ভিখারী পরাণ আমার
বেড়ায়েছে কত ঘুরে,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া জানিনু না প্রেম
বাস করে কোন্ পুরে।
আঁখি জলে ভেসে, ফিরি দেশে দেশে
তবু সুধালেনা কেহ,
প্রেমের নিবাস জিজ্ঞাসেছি যারে,
নীরব হয়েছে সেহ।
প্রেম যদি নাই কঠিন ধরায়
কেমনে মানুষ বাঁচে,
প্রেম প্রেম করি ফিরে নর নারী
কল্পনায় প্রেম আঁকে,
প্রেম স্বরগের অমূল্য রতন,
হেথা সেথা সেকি থাকে ?
কণামাত্র সেই স্বরগের ধন
হৃদয়ে নিহিত যার,

এ মর ধরায় যার নাক রেখা
তুলনা একটি তার।
প্রেমময় ওগো! একবিন্দু প্রেম
করেছেন যারে দান,
যাতনা-পীড়িত মানবের তরে
কেঁদেছে তাহার প্রাণ।
একবিন্দু প্রেম সাগর হইয়ে
ভাষায় সকল ধরা।
বিদ্যাসাগরের অতুল হৃদয়
ছিল সেই প্রেমে ভরা।
বাঁধা থাকে কিগো এ প্রেম কথন
সঙ্কীর্ণ সীমার মাঝে,
আপনি উথলে করুণার ধারা
দীন দুঃখীদের কাছে।
কাঁদিছে বিধবা উপবাসী তায়
সন্তান করিয়ে কোলে,
আছে কত ধনী আত্মীয় স্বজন
চাহিল না মুখ তুলে।
বিদ্যাসাগরের কোমল হৃদয়ে
বহিল করুণা ধারা,
মুছাইতে গিয়ে আঁখি জল তার
আপনি কাঁদিয়ে সারা।
কত শত শত দুঃখিনীর বাছা
করুণায় আজি যাঁর
ধনী মানী মাঝে হইয়ে গণিত
গাহিছে সুযশ তাঁর।
শুনি নিদারুণ মরণ বারতা
অনাথ অনাথা যত,
ঘরে ঘরে আহা আকুল হইয়ে
কাঁদিছে আজি কে কত।
যাঁরমুখ দেখে পিতৃহীন শিশু
পিতৃশোক যেত ভুলে,
দীন নিরাশ্রয় সন্তানেরে যিনি
লইতেন কোলে তুলে।
পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকা
ফেলিছে নয়ন ধারা,
কি হবে ভাবিয়ে স্বদেশের লোক
হয়েছে বিহ্বলপারা।
প্রতি নর নারী কাতর হৃদয়ে
দয়াময়ে আজি ডাক,
করুণাসাগর বিদ্যাসাগরেরে
চিরশান্তি সুখে রাখ।*

শ্রীমতী উমাশশী দেবী।

লক্ষ্যহীন জীবন।

লক্ষ্যহীন প্রাণ মোর ঘুরিতেছে দিশাহারা,
সুখ নাই শান্তি নাই, যেন গো পাগলপারা।
হেথা বসি সেথা বসি কিছুতে আরাম নাই,
আকুল নয়নে হায়! জগতের পানে চাই।
সবাই করিছে কায,জীবনের দুঃখ নাশি,
আমার জীবন শুধু বিফলে যেতেছে ভাসি।
যার হাতে আছে কাজ দেখি তার হাসিমুখ,
লক্ষ্যহীন প্রাণ মোর নাহি আশা নাহি সুখ।
লক্ষ্যহীন তরি খানি কাল সিন্ধু পানে,
চলিয়াছে বেগে যেন মরণ লাগিয়া;
ঘুরিতেছে অহরহ ঘূর্ণিপাক টানে,
অতল দহেতে কোথা যাইবে ডুবিয়া।

বিশ্বদেব! বলে দাও কোন্ পথে যাব,
চালাইয়া লয়ে চল তোমার সন্ধানে;—
জীবনের লক্ষ্য মোর কোথা গেলে পাব,
তুমিহে কাণ্ডারী! লক্ষ্যহীন এ জীবনে।

শ্রীমতী কুমারী সরলাবালা দেবী।

---

* স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তিত।

যে এই পরমসুখে বিবর্জ্জিত হইবে, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। ঈশ্বর আমাদিগের ও তাহাদিগের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ করিয়া দিয়াছেন যে আমরা অনির্ব্বচনীয় শক্তি ভাষা দ্বারা মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হই, তাহারা তাহা পারে না। কিন্তু তাহাদিগের যে স্বতঃসিদ্ধ অসংলগ্ন অপরিস্ফুট শব্দাদি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার মূলে যে বাগ্দেবী মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন। * অতএব অবাধে বলা যাইতে পারে যে, পশু পক্ষিগণ যাহা দ্বারা স্ব স্ব সুখ দুঃখাদি প্রকাশ করে, তাহাই উহাদিগের ভাষা। ইহাদ্বারা উহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট স্ব স্ব ভাব ব্যক্ত করিতে পারে—আনন্দধ্বনি করিতে পারে, বিলাপও করিতে পারে। পশু পক্ষীর কথা দূরে থাকুক, ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গাদিতে এই ঐশ্বরিক ভাব পরিলক্ষিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বকার বামাবোধিনীতে "পিপীলিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে।

আমেরিকার সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ব ও পক্ষিতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ৺সিঃ সিঃ আবট উপরি-উক্ত মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। প্রায় বিশ বৎসর অতীত হইল ইনি ইংলণ্ডের কোনও এক সাময়িক পত্রিকায় এতৎসম্বন্ধীয় এক সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। সম্প্রতি ইনি ফিলাডেলফিয়ার কোন সংবাদ পত্রে লেখেন যে, পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় সাময়িক পত্রিকায় যে মত প্রকাশিত হয়, এতদিন পরেও তিনি তাহার পোষকতা করিতেছেন। শুধু তাহা নহে। এবিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হইতেছে। ইনি বলেন যে, সকল পক্ষী গান গায় না বটে, কিন্তু একটিও মূক বা বাক্শক্তিহীন নয়। অনুসন্ধারীর জানা উচিত যে, যাহা আমাদিগের কর্ণে কর্কশ লাগে, পক্ষীর কর্ণে অনেক সময়ে তাহা ভাল লাগে। ইনি আরও অনুমান করেন যে প্রাচীন সময়ে অতি অল্প গায়ক পক্ষী ছিল। শত শত বৎসরের উন্নতি দ্বারা ইহারা বর্ত্তমান গানশক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা কেবল শাবক উৎপন্ন করিবার সময় গান গাইত, এক্ষণে অন্যান্য সময়েও ইহাদিগকে গান গাইতে শুনা যায়। ইহা হইলেও ইহাদিগের পূর্ব্ব অভ্যাস এখনও বিশেষরূপে তত্ত্বানুসন্ধায়ীর দৃষ্টিগোচর হয়।

* "নিউ রিভিউ" নামে মাসিক পত্রিকায় ডাক্তার গার্ণার কর্ত্তৃক লিখিত সুচারু প্রবন্ধ দেখ।

উদাসীনের চিন্তা।

বিনয়।

বিদ্যাবিনোদপুরে সুধেন্দু বাবুর বাস। তাঁহার পুত্রের নাম বিনয়কুমার। নাম বটে বিনয় কুমার, কিন্তু বিনয় দুর্ব্বিনীতের একশেষ। বিনয়ের দুর্ব্বিনীত হইবার প্রথম কারণ এই যে তাহার পিতামহী বর্ত্তমান। সুধেন্দু বাবুর পাঁচ কন্যার পর এক পুত্র, তাই বিনয়ের আদরের সীমা নাই। পিতামহী তাহাকে মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছেন। পিতামহী গৃহকর্ত্রী, বৌত সম্পূর্ণ তাঁহারই অধীন। পুত্র সুধেন্দু বাবু মাতৃভক্ত সন্তান। মাতৃ-আদেশ তাঁহার নিকট বেদবাক্য, সুতরাং পরিবারের সকলের উপর পিতামহীর অপরিসীম প্রভুত্ব। পিতামহী যখন বিনয়ের অধীন, তখন বিনয়ই পরিবারের রাজা। বর্ষীয়সী পিতামহী নপ্তা বা নাতীর আদেশ প্রতিপালন জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। পুত্র, পুত্রবধূ কিংবা অপর কেহ যদি নপ্তার ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, অমনি পিতামহীর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নপ্তার পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক বিরুদ্ধাচারীকে বাক্যবাণে নির্যাতন করিতে থাকেন। বিনয় পিতামহী হইতে এইরূপ সাহস এবং সহানুভূতি পাইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে আপনাকে প্রভূত শক্তিশালী পুরুষ মনে করিয়া দুর্ব্বিনীত ও দুরন্ত হইয়া উঠিল। মানুষ যাঁহাদিগের নিকট অবনত হইবে, যাঁহাদিগের আদেশ শিরোধার্য্য করিবার জন্য বিধাতার বিধানানুসারে বাধ্য, যদি তাহাদিগের নিকট অবনত হইতে শিক্ষা না করে, প্রত্যুত তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুবিধা ও সুযোগ পায়, তাহাহইলে সে দুর্ব্বিনীত হইবে বিচিত্র কি? আত্মশক্তিকে ক্ষুদ্র মনে না করিতে পারিলে কেহ বিনীত হইতে পারে না। মহতী শক্তির সহিত তুলনা করিলেই মানুষ আত্মশক্তির ক্ষুদ্রতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে পিতা মাতার শক্তির সহিত আত্মশক্তি তুলনা করিবার সুবিধা পায়। কিন্তু পিতা মাতা অথবা পিতামহ পিতামহীর নির্ব্বুদ্ধিতা ও চিত্ত-দৌর্ব্বল্য জন্য যদি কোন সন্তান আত্মশক্তিকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া অনুভব করিবার সুবিধা পায়, তাহাহইলে কোনক্রমেই তাহার প্রাণে বিনয় স্থান পাইতে পারে না। যে ব্যক্তি পরিবারের গুরুজনদিগের নিকট বিনয়ী হইতে পারে না, সে পরিবারের বাহিরের শ্রেষ্ঠতর গুণী ব্যক্তিদিগের সহিত আত্মশক্তি তুলনা করিয়া আপামাকে নিকৃষ্ট

মনে করিবে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। বিনয়ের দুর্বিনীত হইবার দ্বিতীয় কারণ পরিবারে অপরব্যক্তির দোষের সমালোচনা। সুখেন্দু বাবু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী জগতে প্রশংসার উপযুক্ত লোক দেখিতেন না। কার্য্যকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যখন দম্পতী একত্র উপবেশন করিতেন, তখন প্রতিবেশী, গ্রামবাসী এবং পরিচিত ব্যক্তি মাত্রের চরিত্রের সমালোচনা আরম্ভ করিতেন। তাঁহাদের সমালোচনার বিষাক্ত বাণ হইতে কাহারও নিষ্কৃতি পাইবার সাধ্য ছিল না। যাঁহাদিগের সাধুতার সৌরভে জগৎ মুগ্ধ, সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের অতি সামান্য দোষও এই দম্পতীর দৃষ্টিসমক্ষে উদ্ভাসিত হইত। পুত্র বিনয়কুমার পিতৃ মাতৃ মুখবিনিঃসৃত সেই গরল ধারা পান করিয়া আত্মপ্রাণকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। জনক জননী যেমন পৃথিবীতে শ্রদ্ধার পাত্র—যাঁহার সমীপে তাঁহাদিগের গর্ব্বিত মস্তক অবনত হইতে পারে এইরূপ লোক অন্বেষণ করিয়া পাইতেন না, সন্তানও তেমনি সকলের উপর আপনার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া অবজ্ঞারচক্ষে সমস্ত নরনারীকে নিরীক্ষণ করিতেন। গুণে জ্ঞানে ধনে মানে পদমর্য্যাদায় তাহার প্রতিযোগী কেহ হইতে পারে, এই বিশ্বাস তাহার ছিল না। পিতামহীর প্রশংসা, জনক জননীর সহানুভূতি, এই বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল করিয়াছিল। কল্পনার শিরে আরোহণ করিয়া বিনয়কুমার যতই আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে লাগিল, ততই অহঙ্কারে তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। জনক জননী সন্তানের এইরূপ গর্ব্বিতভাব প্রত্যক্ষ করিয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে বিনয়কুমার জগৎকে উপেক্ষা করিত বলিয়া তাঁহাদের এ ক্লেশ হয় নাই, কারণ তাঁহাদেরও স্বাভাবিক ইচ্ছা এই ছিল যে বিনয় আত্মাভিমান শিক্ষা করুক। কিন্তু বিনয় যে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিত, এ কষ্ট আর প্রাণে সহ্য হইত না। বিনয়কুমার দুর্বিনীত হইয়া পাপ পথে অগ্রসর হইতেছে ইহা যত না কষ্টের কারণ, তাঁহাদিগের আত্মাভিমান সন্তানের নিকট চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, সন্তানের অপব্যবহারের জন্য লোকনিন্দার বিষাক্ত তীর তাঁহাদিগের অভিমানের অঙ্গে সজোরে আঘাত করিতেছে এই সমস্ত দুর্ব্বিবহ যন্ত্রণায় দম্পতী অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই একদিন তাঁহাদিগের পরমাত্মীয় চন্দ্র বাবু বাড়ীতে আসিলে প্রাণের ক্লেশ সমস্ত খুলিয়া তাঁহাকে বলিলেন। চন্দ্র বাবু সুখেন্দু বাবুর পরিবারের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন যে পরিবারের অন্তরের সংবাদ কিছুই তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। যে যে কারণে বিনয়কুমারের মন দুর্বিনীত হইয়া পড়িতেছে,

তিনি সুধেন্দু বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট তাহা বর্ণন করিলেন। কিন্তু দম্পতীর যতটুকু দোষ প্রদর্শন করিলেন, তাহা তাঁহাদের মনে স্থান পাইল না। সুধেন্দুর সহধর্ম্মিণী কুসুমকুমারী সমস্ত দোষ শ্বশুড়ী ঠাকুরাণীর ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিলেন। এই বিষয় লইয়া চন্দ্র বাবুর সহিত বিলক্ষণ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। চন্দ্রবাবু কোন ক্রমেই দম্পতীকে তাঁহাদের দোষ হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি নিরাশ হইয়া বলিলেন "বিনয়ের রোগ দুশ্চিকিৎস্য। প্রথমতঃ বিনয়ের বয়স অধিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতি যখন কোমল থাকে, তখন ইচ্ছানুরূপ তাহা গড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি কঠিন হইয়া পড়িলে আর সে অবস্থা থাকে না। তবে প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলে কৃতকার্য্য হইবার কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ যে সকল কারণে রোগোৎপত্তি হয়, সে সকল কারণ যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন রোগোপশম হইবার আশা কোথায়? সুচিকিৎসকগণ রোগের কারণ অপনোদন করিবার জন্যই সর্ব্ব প্রথমে চেষ্টা করেন। আপনাদিগের বাড়ীতে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। আমি বলিতে পারি বিনয়ের সমক্ষে যদি আপনারা লোকের নিন্দা করিতে থাকেন, তাহা হইলে কোন কালে তাহার প্রাণে বিনয়ের ভাব আসিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে আপনারা যদি কোন দোষী ব্যক্তিরও দোষের ভাগ পরিবর্জ্জন করিয়া গুণের প্রশংসা করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহা শুনিয়া বিনয়ের মন সেদিকে আকৃষ্ট হইতে পারে, এবং সেই গুণরাশির নিকট তাঁহার গর্ব্বিত মস্তক অবনত হইতে পারে। অন্যথা আপনারা বাহিরের অনেক উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, বিনয়কে শারীরিক শাস্তি প্রদানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, নানা বিধ প্রলোভন প্রদর্শনে তাহার চিত্তকে বিনীত করিবার প্রয়াস পাইতে পারেন, কিন্তু সে সকল চেষ্টা ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

চন্দ্রবাবুর যুক্তি বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতী সুদূরদর্শী এবং আত্মদোষক্ষালন-ক্ষম পুরুষ এবং মহিলার সমীপে জ্ঞানগর্ভ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু পরছিদ্রান্বেষী এবং আত্মদোষ দর্শনে সম্পূর্ণ অপারগ সুধেন্দু বাবু ও কুসুমকুমারীর সমীপে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। চন্দ্রবাবু বিদায় গ্রহণ করিলে পর তাঁহারা বসিয়া তাঁহারই কুৎসা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিনয়কুমার পার্শ্বের গৃহে উপবেশন করিয়া সেই সুখাদ্য উদরস্থ করিতে লাগিল! বিনয়ের বিনীত হওয়ার আশা চিরদিনের তরে নির্ব্বাপিত হইল। বিনয়ের বয়োবৃদ্ধির সহিত জনক জননীর দুঃখানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

যাঁহাদিগের আত্মদোষে সন্তান নষ্ট হয়, তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে আত্মশাসন করা কর্ত্তব্য। আত্মশাসনে অসমর্থ ব্যক্তির আত্মদোষে সন্তানের চরিত্র দূষিত হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শোকানলে দগ্ধীভূত হইতেই হইবে। বিধতার বিধি অলঙ্ঘ্য। যে কার্য্যের যে ফল, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। নির্ব্বোধ মানুষ তাহা না বুঝিয়া অশ্রু জলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিলেও সে বিষয়ের অন্যথা হইবে না। বুদ্ধিমান্ পুরুষ এবং বুদ্ধিমতী মহিলা বিধাতার বিধি আবিষ্কার করিয়া তাহারই অনুবর্ত্তন করেন। এইরূপ করিলে তাঁহাদিগকে আর অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে হয় না। তাঁহারা বিধাতার আদেশ পালন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও শান্তি সুখ লাভের অধিকারী হন।

প্রহ্লাদের ন্যায়পরতা।

যখন পরম ধার্ম্মিক দৈত্যকুল-ভূষণ প্রহ্লাদ রাজাসনে আসীন হইয়া সুনিয়মে রাজ্য পালন করিতেছিলেন, তখন বিরোচন নামে তাঁহার একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই মহাবদান্য বলির জনক ছিলেন। বিরোচন শৈশবে পিতা মাতা কর্ত্তৃক রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া কৈশোরে উপনীত হইয়াছেন, এই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার রাজ্যস্থ কোন সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কলহ করিয়া বলিলেন যে সংসারে রাজা শ্রেষ্ঠ। দ্বিজপুত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "সংসারে দ্বিজই শ্রেষ্ঠ, কেন না দ্বিজগণ জ্ঞানে ও ধর্ম্মাচরণে ধরামধ্যে অদ্বিতীয়, ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রপ্রণেতা ও প্রজাপালন, রাজ্যরক্ষাদির নিয়ন্তা ; যোগপরায়ণ, বিশ্বের হিতাভিলাষী, নৃপতিগণের উপদেষ্টা, নিরীহ, লোভপরিবর্জ্জিত, অভাব সঙ্কোচকারী ইত্যাদি গুণে দ্বিজগণ ধরামর বা ভূদেব বলিয়া অভিহিত। বিরোচন বলিলেন "যদি রাজা ন্যায়ানুসারে রাজ্যরক্ষণ, ও অনুধাবণ করিয়া শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমন না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের এ সকল গুণ কোন্ কার্য্যে আসিত ?" এইরূপে দুইজনে বহুক্ষণ ধরিয়া তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল, পরে দ্বিজপুত্র বলিলেন "চল, তোমার পিতার নিকট যাইয়া ইহার মীমাংসা করি, যিনি বিচারে পরাজিত হইবেন তাঁহার জীবন পণ থাকিল।" বিরোচন বলিলেন "ভাল, তাহাই হউক।" এই বলিয়া দুইজনে মহাত্মা প্রহ্লাদের নিকট চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দুইজনের কলহের ও পরাজয়ে জীবন পণের বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। প্রহ্লাদ শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু সত্যের অনু-

রোষে প্রিয়তম পুত্রের জীবন উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "দ্বিজবর! ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ কেননা জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম্মই সংসারে শ্রেষ্ঠ এবং সেই সকল গুণে ভূষিত হইয়া দ্বিজগণ আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন; বিরোচনের জীবন এখন আপনার অধীন, আপনি ইচ্ছা করিলে বিরোচনের জীবন বিনাশ করিতে পারেন।" দ্বিজপুত্র প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া অনন্দ সহকারে বলিলেন, "রাজন্! আপনার পুত্র দীর্ঘজীবী হউন ও আপনার ন্যায় সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুসারে রাজ্য পালন করুন। সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কখনও মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়েন না এবং আপনার সদৃশ ব্যক্তির বংশে যে ব্রহ্মশাপপতিত হইবে ইহাও অসম্ভব, অতএব অপনি এখন আপনার পুত্রকে নিরাপদ দর্শন করুন, আমিও আপনাকে ও আপনার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করি।

কুরুক্ষেত্র পর্য্যটন।

রেলওয়ের দ্বারা দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেরূপই হউক না বাণিজ্য ও গমনাগমনের যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা রবিবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া প্রভাতে মোকামা আসিলাম এবং পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে বেলা ১০টার সময় স্থানেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

ষ্টেশন হইতে স্থানেশ্বর অর্দ্ধ ক্রোশ দূর। একা আরোহণে স্বল্পক্ষণ মধ্যেই নগরে উত্তীর্ণ হইলাম। প্রথমে কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন হ্রদ সন্দর্শন করিয়া স্থানেশ্বরে রামহ্রদে স্নান করিব সংকল্প করিলাম। নগর হইতে দ্বৈপায়ন হ্রদ অর্দ্ধ ক্রোশ দূর। একাআরোহণে গমন করিতে কিছু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু পদব্রজে যাইতে কিছুই আয়াস নাই। পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় "একা" কি পদার্থ জানেন না। তাঁহাদিগের জন্য ইহার সটীক বিবরণ প্রকটিত করা গেল। একা—একখানি দুই চাকায় গাড়ী—উপরে একটী মঞ্চ। ইহা রঙ্গিল বস্ত্র বা ক্যাম্বিসের ঘেরা টোপে আবৃত। ইহার মধ্যে কেবল একজন মাত্র বসিতে পারে। দুই বা তিনজন কখন কখন চারিজনেও বসিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। মঞ্চের বা বসিবার আসনের নিম্নে দুইপার্শ্বে কতকগুলি খঞ্জনী বা করতাল সজ্জিত আছে, তাহা এরূপভাবে অবস্থাপিত যে শকটখানি চলিবামাত্র ঝম্ঝম্ করিয়া বাজিতে থাকে। কোন কোন শকটে লোহার স্প্রীং থাকে। সে গুলি অধিক

দোলে না, কিন্তু যাহাতে লোহার স্প্রীং নাই, তাহা প্রতি আস্কন্দনে আন্দোলিত হইয়া আরোহীর যন্ত্রণার কারণ হইয়া থাকে। গো-শকটে যে প্রকার আরোহণ করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ উঠিতে হয়। তবে সমর্থ পুরুষেরা চাকার উপর ভর দিয়াও আরোহণ করিতে পারেন। একজনের সমাবেশ হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম "এক্কা" হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত ইহার বাহন অশ্বের বেশ ভূষাও চমৎকার। পৃষ্ঠে বিচিত্র আস্তরণ, মস্তকে কড়ী বা বীড়ের উজ্জ্বলমালা এবং গলদেশে চর্ম্মবন্ধনী মধ্যে মধ্যে ঘণ্টিকায় গ্রথিত বা সজ্জিত, চলিবার সময় তালে তালে নিনাদিত হয়। দূর হইতে শকটস্থ করতালের বাদ্যের সহিত অশ্বের কণ্ঠমালাস্থ ঘণ্টিকা নিনাদের মিশ্র আরাব শুনিতে বড়ই মধুর! যাঁহারা "এক্কার" এই চিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাঁহারা বটতলার মুদ্রিত "রাম রাবণ বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের" "রথ-চিত্র" সন্দর্শন করিলে কতকটা আভাস প্রাপ্ত হইবেন। আমরা এইরূপ রথা-রোহণে কুরুক্ষেত্র পর্য্যটন করিলাম। আমাদের রথে লোহার স্প্রীং ছিল না, সুতরাং আরোহণের যে সুখ, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারিবে। বিশেষতঃ আমরা এক এক রথে তিন তিন জন করিয়া আরোহণ করিয়াছিলাম (কারণ ষ্টেশনে দুই খানির অতিরিক্ত শকট ছিল না), সুতরাং কষ্টের ইয়ত্তা ছিল না। যদি দর্শনাকাঙ্ক্ষার কৌতূহলের উদ্রেক না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ক্ষণমাত্রও তদবস্থ থাকিতে পারিতাম না। যাহাহউক বেলা ১১টার সময় দ্বৈপায়ন হ্রদে সমুপস্থিত হইলাম। হ্রদটী দর্শনমাত্রেই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবোদয় হইল। দ্বৈপায়নের সঙ্গে সমগ্র মহাভারত সম্মুখে বিদ্যমান। স্মৃতি-লোচনে ভাবসংযোগে চিন্তানিমিষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্য কুরুক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইয়া অচেতন রহিয়াছে, মহারাজ দুর্য্যোধন ভগ্নোদ্যম হইয়া নৈরাশ্য অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বৈপায়ন হ্রদ আশ্রয় করিয়া লুক্কায়িত আছেন। অগ্নিশর্ম্মা ভীমসেন কূলে দণ্ডায়মান হইয়া রোষ-কষায়িত নেত্রে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া হ্রদ শোষণ করিতেছেন। আজ কৃতকার্য্য হইলে তিনি প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, এই চিন্তায় সমাকুল হইতেছেন। সন্দেহ ও আশায় হৃদয় উদ্বেলিত, তথাপি সাহসের ক্ষুণ্ণতা নাই। অকুতোভয়ে জলদগম্ভীর নাদে দুর্য্যোধনের উদ্দেশে কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। মহামানী দুর্য্যোধন "জ্ঞাতি দুর্বাক্য অসহ্য" বোধে লুক্কায়িত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধ ভরে ভীমসেনকে আক্রমণ করিতেছেন! ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ! অদূরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি অন্য চারি ভ্রাতা দণ্ডায়মান, সম্মুখে হলায়ুধ জয়